সমগ্র বিশ্বে সাড়াজাগানো গ্রন্থ

আস-সুন্নাহ ওয়ামাকানাতুহা ফিত-তাশরিয়িল ইসলামি-এর অনুবাদ

সুন্নাহ ও প্রাচ্যবাদ

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ড. মুসতফা আস-সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহ

(১৩৩৪–১৩৮৪ হিজরি)

(১৯১৫–১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)

ভূমিকা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ

আহমাদ রিফআত

দাওরায়ে হাদিস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া,

সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সম্পাদক : ipaedia.org

সম্পাদনা

শাব্বীর মুহাম্মদ

লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সুন্নাহ ও প্রাচ্যবাদ
ড. মুসতফা আস-সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৯৭-৯৯৫৩৪৩
www.facebook/pothikprokashon
Email: pothik1prokashon@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২৪

২১শে বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
boisodai.com
bookriver.com.bd
pothikshop.com
islamicboighor.com
raiyaanshop.com

দুই খণ্ড একত্রে মূল্য : ১৭০০/-

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ১৩
মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা ১৭
নবি ও রাসুল ১৭
মুজিজার পরিচয় ১৮
নবির প্রতি ওহি আগমনের পদ্ধতি ১৮
হাদিস অস্বীকারের সূচনা ২৯
হাদিসের নামে বর্ণনা জাল করা যেভাবে শুরু হলো ৩০
হাদিসের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের শত্রুতা ৩২
হাদিস সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ৩৪
বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ৩৭
অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ৩৮

প্রাক্‌কথন ৪০
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ৪০
লেখকের কথা ৪৫
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ৪৫
গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণা ৪৬
আবু রাইয়ার গ্রন্থের পর্যালোচনা ৪৬
প্রথম পর্যালোচনা : ইসলামি আইনে সুন্নাহর মর্যাদা ৪৬
ইসলামি আইন বিন্যস্তকরণ প্রক্রিয়া ৪৭
যুগে যুগে সুন্নাহর বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণ ৪৭
দ্বিতীয় পর্যালোচনা : 'মিথ্যা' গবেষণার বেড়াজাল ৪৮
জালে আটকে যাওয়ার কি কারণ? ৪৮
তৃতীয় পর্যালোচনা : আবু রাইয়ার বইয়ের প্রকৃত বাস্তবতা ৪৯
'নির্ভরযোগ্য' গ্রন্থাদির উদ্ধৃতির স্বরূপ ও বাস্তবতা ৫০

আলেমগণের রেফারেন্সের বাস্তবতা ৫১
উৎসগ্রন্থের বিশাল তালিকার স্বরূপ.....৫১
চতুর্থ পর্যালোচনা : মুতাজিলাদের চিন্তাধারা..... ৫৩
মুসলিম আলেমদের সঙ্গে মুতাজিলাদের শত্রুতা..... ৫৪
পঞ্চম পর্যালোচনা : শিয়া-লেখকদের গ্রন্থাবলি..... ৫৫
একটি ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতা: সাহাবায়ে কেরামের গৃহযুদ্ধের আসল কারণ ৫৫
সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শিয়া-লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি..... ৫৫
সময়ের দাবি..... ৫৬
শিয়া-সুন্নি ঐক্য.....৫৭
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা..... ৫৮
শিয়াদের কথা ও কাজে দ্বিমুখী আচরণ ৫৯
প্রফেসর আবু রাইয়ার গ্রন্থ পারস্পরিক ঐক্যের জন্য কঠিন প্রতিবন্ধক . ৬০
এই গ্রন্থে শিয়াদের সুন্নাহর স্বরূপ ও অধম লেখকের সাবধানতা ৬১
বরেণ্য শিয়াদের ব্যাপারে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ৬২
ষষ্ঠ পর্যালোচনা: প্রফেসর আবু রাইয়ার তৃতীয় উৎস— 'প্রাচ্যবিদদের কথা' ৬৩
বর্তমান সময়ের প্রাচ্যবিদদের সাথে সাক্ষাৎ ও তার প্রতিক্রিয়া..... ৬৩
প্রাচ্যবিদদের সাথে সাক্ষাৎ ও প্রাচ্যবাদ-বিষয়ক লেখার জন্য গভীর অধ্যয়ন ও স্বচক্ষে তাদের দেখে অর্জিত অভিজ্ঞতা..... ৭০
প্রাচ্যবিদদের চরম গোঁড়ামির একটি দৃষ্টান্ত ৭১
আফসোসজনক পরিস্থিতি ৭৩
এই দুরবস্থার প্রতিকার..... ৭৩
আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি..... ৭৩
আরেকটি শিক্ষণীয় ঘটনা.....৭৪
প্রাচ্যবিদদের ব্যাপারে আমার শেষকথা.....৭৭
পশ্চিমা গবেষণা ও অধ্যয়নের পথে দুটি কঠিন প্রতিবন্ধকতা ৭৮
প্রথম প্রতিবন্ধকতা ৭৮
দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা ৭৯

দুঃখজনক অতীত এবং আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির প্রাচ্যবিদদের গবেষণা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণ ৮০
আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণির দুর্বলতা ও তার কারণ ৮১
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সচেতনতা এবং চিন্তাগত গোলামি থেকে মুক্তির সূচনা ৮১
আনন্দময় ভবিষ্যৎ এবং ইমানজাগানিয়া আশা-আকাঙ্ক্ষা ৮২
প্রবন্ধকারের একটি আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাচ্যবিদদের মুখে লাগাম দেওয়ার চেষ্টা৮৩
এখন সময় এসে গেছে ৮৪
একটি সংশয় নিরসন ৮৫
গোস্তাফ বোলোনের ন্যায়সম্মত বর্ণনা ও শেষ কথা ৮৬
সপ্তম পর্যালোচনা: প্রফেসর আবু রাইয়ার বইয়ের চতুর্থ উৎস—'গল্প-কাহিনির সাহিত্যগ্রন্থ' ৮৮
গোল্ডজিহারের কাছে সুন্নাহের মর্যাদা ৮৯
অষ্টম পর্যালোচনা: প্রফেসর আবু রাইয়ার সুন্নাহ-বিষয়ক গবেষণার ফলাফল এবং তার ওপর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ৯০
এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আসল সমস্যার সমাধান ১০৫
ইবনু কুতাইবা ও মুহাদ্দিসগণ : একটি পর্যালোচনা ১০৮
শেষকথা ১১০
আবু রাইয়া সম্পর্কে লেখকের মতামত ১১০

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ১১৬
সুন্নাহর অর্থ ও পরিচয় এবং সুন্নাহ প্রসঙ্গে সাহাবিগণের অবস্থান ১১৬
সুন্নাহর প্রথম অর্থ ১১৬
সুন্নাহর দ্বিতীয় অর্থ ১১৮
সুন্নাহর তৃতীয় অর্থ ১১৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর আনুগত্য আবশ্যক ১২০

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরও তাঁর আনুগত্য আবশ্যক ১৩১
যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম সুন্নাহ শিখেছেন ১৩৫
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সুন্নাহ কেন সংকলিত হয়নি? নবিযুগে কি সুন্নাহর কোনো অংশ লেখা হয়েছিল? ১৩৮
খোলাসা কথা ১৪২
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হাদিস গ্রহণ ও সংরক্ষণে সাহাবায়ে কেরামের পদক্ষেপ ও নীতিমালা ১৪৩
অধিক হাদিস বর্ণনা করায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি কোনো সাহাবিকে আটক করেছিলেন? ১৪৯
আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৫০
সাহাবিগণ কি কোনো সাহাবির হাদিস গ্রহণের জন্য শর্তারোপ করতেন? .. ১৫৪
দ্বিতীয় শ্রেণির বর্ণনাগুলোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা ১৬১
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রসঙ্গ ১৬১
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৬৪
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৬৭
হাদিস অন্বেষণে সাহাবিগণের দূরদূরান্তের বিভিন্ন শহরে সফর ১৬৭
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অধিক হাদিস বর্ণনাকারী কয়েকজন সাহাবি ১৭০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৭২
জাল হাদিসের সূচনা ও প্রেক্ষাপট ১৭২
কখন থেকে হাদিস জাল করা শুরু হলো? ১৭২
কারা জাল হাদিস রচনা শুরু করল? ১৭৩
যে প্রেক্ষাপটগুলোতে জাল হাদিস তৈরি হয়েছে ১৭৯
খারেজিরা কি মিথ্যা হাদিস প্রচার করত? ১৮৬
খারেজিরা হাদিস জাল করত—এই দাবির পক্ষে পেশকৃত দুটি দলিল .. ১৮৭
মিথ্যা হাদিস রচনাকারীদের শ্রেণিবিন্যাস ২০২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ.....২০৫
জাল হাদিস প্রতিরোধে তৎকালীন আলিমগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ২০৫
প্রথমত: হাদিসের সূত্র ২০৫
দ্বিতীয়ত: হাদিসের প্রামাণ্যতা যাচাই করা ২০৭
তৃতীয়ত: বর্ণনাকারীগণের গুণাগুণ বিচার এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে দেখা ২০৯
জাল হাদিস চেনার আলামত ২২১
সূত্রসম্পর্কিত আলামত ২২১
হাদিসের পাঠসম্পর্কিত আলামত ২২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ..... ২৩৮
ইমামগণের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলাফল..... ২৩৮
প্রথম সুফল: সুন্নাহ সংকলন ২৩৮
উমর ইবনু আবদুল আজিজের ফরমান কি বাস্তবায়ন হয়েছিল?..... ২৪১
দ্বিতীয় সুফল: হাদিসশাস্ত্রের পরিভাষা সংকলন ২৪৫
তৃতীয় সুফল : জারাহ-তাদিলের নীতিমালা ২৪৮
চতুর্থ সুফল: উলুমুল হাদিস শাস্ত্র.....২৫৩
পঞ্চম সুফল: জাল বর্ণনা ও বর্ণনাকারীদের চিহ্নিতকরণে ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন ২৬৪
ষষ্ঠ সুফল: লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা ২৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিকা.....২৭০

প্রথম পরিচ্ছেদ ২৭১
সুন্নাহ সম্পর্কে শিয়া ও খারেজিদের দৃষ্টিভঙ্গি..... ২৭১
খারেজিদের অভিমত.....২৭৬
শিয়াদের অভিমত ২৭৭
জমহুরের অভিমত ২৭৮

শিয়া ও খারেজিদের মধ্যকার পার্থক্য ২৮০
সারকথা..... ২৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৮২
সুন্নাহ সম্পর্কে মুতাজিলা ও মুতাকাল্লিমিন (কালামশাস্ত্রবিদ)-দের দৃষ্টিভঙ্গি ২৮২
ওয়াসিল ইবনু আতা (মৃত্যু: ১৩১ হিজরি) ২৮৫
আমর ইবনু উবায়দ ২৮৭
আবুল হুজায়ল (মৃত্যু: ২২৭/২৩৫ হি.) ২৮৮
আন-নাজ্জাম..... ২৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ..... ৩০০
নিকট অতীতে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ৩০০
ইমাম শাফেয়ি ও মুনকিরে হাদিসের বিতর্ক..... ৩০০
দীর্ঘ বিতর্কের মূলকথা ৩১১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ..... ৩২২
বর্তমান সময়ে সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি..... ৩২২
সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দলিল ও সন্দেহসমূহ..... ৩২২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৩৫২
'খবরে ওয়াহেদ' বা একক সূত্রে বর্ণিত হাদিসের প্রামাণ্যতা অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি..... ৩৫২
খবরে ওয়াহেদকে শরিয়তের হুজ্জত অস্বীকারকারীদের সন্দেহ..... ৩৫৪
এসব সন্দেহের জবাব..... ৩৫৬
খবরে ওয়াহেদ শরিয়তের হুজ্জত হওয়ার দলিলসমূহ ৩৬৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ..... ৪০১
সুন্নাহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের তৈরি করা সংশয়-সন্দেহ ৪০১

প্রাচ্যবিদদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রুসেড বাহিনীর আক্রমণের উদ্দেশ্য.....৪০১
ড. গোল্ডজিহার (Goldziher) ও সুন্নাহ সম্পর্কে তার চিন্তাধারার মূল ভাষ্য এবং সহিহ হাদিস নির্ধারণে সন্দেহ রোপণের প্রয়াস ৪০৫
শরিয়তের বিধিবিধান সম্পর্কেও হাদিস রচনা করা হতো..... ৪১১
গোল্ডজিহারের সংশয় ও তার নিরসন এবং প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারা ও সন্দেহের জবাব ৪১৬
হাদিস কি মুসলমানদের চিন্তার উৎকর্ষের ফসল?..... ৪১৭
১. ইসলামে উমাইয়াদের অবস্থান.....৪২০
২. মদিনার আলিমগণ কি হাদিস জাল করতেন?..... ৪২৪
৩. দীন রক্ষার জন্য আমাদের আলিম সমাজ কি মিথ্যাচার বৈধ করেছেন? ৪২৭
৪. হাদিসে মিথ্যার অনুপ্রবেশ প্রথম কীভাবে হলো?..... ৪২৯
৫. হাদিস জালকরণে উমাইয়া সরকারের হাত ছিল কি?.....৪৩১
৬. হাদিসের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণসমূহ.....৪৩২
৭. জাল-হাদিসে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাত ছিল (?) ৪৩৪
৮. উমাইয়ারা কি ইমাম জুহরিকে হাদিস জালকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে?..... ৪৩৬
ইমাম জুহরি রাহিমাহুল্লাহ ও ইতিহাসে তার স্থান ৪৩৭
ইমাম জুহরির নাম, বংশ, জন্ম-মৃত্যু ও সংক্ষিপ্ত জীবনী..... ৪৩৮
শিক্ষাজীবন ৪৩৮
ইমাম জুহরির আকৃতি, অনুপম চরিত্র ও গুণাবলি.....৪৩৯
জুহরির স্মৃতিশক্তির অবিস্মরণীয় ঘটনা..... ৪৪২
ইলমে হাদিসে ইমাম জুহরির সুখ্যাতি ও জনসাধারণ্যে এর ব্যাপক স্বীকৃতি ৪৪৩
ইলমে হাদিসে ইমাম জুহরির বিস্তৃতির ওপর তাঁর সমকালীন আলিমদের প্রশংসা.....৪৪৩
সুন্নাহ-য় ইমাম জুহরির মর্যাদা ৪৪৪
হাদিস ও সুন্নাহর ময়দানে ইমাম জুহরির কৃতিত্ব ৪৪৬

ইমাম জুহরি সম্পর্কে জারাহ-তাদিল শাস্ত্রের ইমামদের মতামত ৪৪৮
ইমাম জুহরি থেকে যারা হাদিস বর্ণনা করেছেন *এবং* তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন ৪৫০
ইমাম জুহরি সম্পর্কে সন্দেহ ও তার জবাব..... ৪৫১
ইবরাহিম ইবনু ওয়ালিদ উমাবির ঘটনা ৪৬৩
গোল্ডজিহার কয়েকটি ভুল ও প্রতারণা.....৪৬৪
ইমাম জুহরিকে হাদিস বানাতে বাধ্য করা হয়েছিল? ৪৬৬
জুহরির রাজদরবারে যাতায়াত ও বাদশাহদের হীন অনুচরবৃত্তি ৪৬৯
হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের সঙ্গে ইমাম জুহরির হজ গমন.....৪৭০
জুহরি কর্তৃক হিশামের সন্তানদের প্রতিপালন ও শিক্ষাপ্রদান ৪৭০
ইমাম জুহরির কাজির পদগ্রহণ ৪৭১

সম্পাদকের কথা

ক্রুসেড পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টানরা তাদের সমর-কৌশল পরিবর্তন করে। প্রায় দুই শতাব্দী জুড়ে মুসলমানদের বিপক্ষে চালানো ক্রুসেড যুদ্ধে বারবার পরাজয়ের পর খ্রিষ্টান-দুনিয়ায় নতুন ভাবনার উদয় হয়। তারা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের পথে অগ্রসর হয়। মুসলমানদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদিস ও আরবি ভাষা-সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করে। এ কাজের জন্য তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রাচ্যবিদ' নামে একদল পণ্ডিত গড়ে তোলে। কালক্রমে সেই ইহুদি-খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ প্রাচ্য দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিশেষ করে ইসলামি জ্ঞান ও শাস্ত্রের নানা শাখার গবেষণা করে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাদের জ্ঞান-সাধনার স্বীকৃতির সঙ্গে এ কথাও প্রমাণিত সত্য যে, ইহুদি-খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদদের অধিকাংশই ইসলামি দীন-শরিয়ত, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ইসলামি তাহযিব-তমদ্দুনের দুর্বলতার সন্ধানেই তাদের সমুদয় মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছেন। রাজনৈতিক স্বার্থ ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তারা তাদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মূলত তাদের অনেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকেই এ কাজে যুক্ত হয়ে সমগ্র মেধা ও শ্রম দিয়ে আজীবন মিশনারী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে গেছেন।

তাদের স্বরূপ উন্মোচন করে পৃথিবীখ্যাত ইসলামিক স্কলার সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন—'অনেক প্রাচ্যবিদকে আমরা দেখেছি, তারা তাদের যাবতীয় প্রয়াস ও সাধনাকে ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি সমাজ এবং ইসলামি সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুসন্ধানে ব্যয় করেন। এরপর নাটকীয় ভঙ্গিতে তা পাঠকদের সামনে পেশ করেন। তারা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করে সামান্য ধূলিকণাকে পাহাড় আর বিন্দুকে সিন্ধু বানিয়ে উপস্থাপন করেন। মেধার প্রখরতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের প্রকৃত চেহারাকে বিকৃত করার কাজে নিয়োগ করেন।' [আল-ইসলামিয়্যাত বাইনা কিতাবাতিল মুসতাশরিকিন ওয়াল বাহিছিনাল মুসলিমিন, পৃষ্ঠা: ১৫-১৬, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, মুদ্রণ: ১৪০৬ হি./১৯৮৬ ঈ.]

তিনি আরও লিখেছেন—'ইহুদি-খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদদের অনেকেই তাদের বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষ মিশিয়ে দেন। যেন তা পরিমিত মাত্রার চেয়ে বেশি না হয় এবং পাঠকদের বিরক্তির কারণ হয়ে তাদেরকে সতর্ক করে না দেয়। সেইসঙ্গে বিজ্ঞ প্রাচ্যবিদ গবেষকের ন্যায়পরায়ণতা ও নিয়তের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দিহান করে না তোলে। এভাবে প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থাবলি সেসব বিরুদ্ধবাদী লেখকদের তুলনায় অধিকতর ক্ষতিকারক ও বিপদজনক, যারা প্রকাশ্যে শত্রুতা প্রকাশ করে থাকেন এবং যাদের বই-পুস্তক মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনায় ভরপুর।' [মাকালাতে মুফাক্কিরে ইসলাম, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ., সংকলক: মাওলানা কাজেম নদভি, খণ্ড: ০২, পৃষ্ঠা:৮০, প্রকাশক: মজলিসে নশরিয়াতে ইসলাম করাচি, মুদ্রণ: ২০০৩ ঈ.]

তাছাড়া প্রাচ্যবিদরা তাদের হীন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এমন সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেন, সাধারণ পাঠকের পক্ষে যা ধরা সম্ভব নয়। প্রথমত, তারা গবেষণার জন্য ইসলাম সম্পর্কিত একটি বিষয় নির্বাচন করেন। এরপর সেই বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা কেবল কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ, তাফসির ও ইতিহাসের উৎসগ্রন্থ থেকেই তথ্য আহরণ করেন না, বরং কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রূপকথা ইত্যাদি অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকেও প্রচুর তথ্য গ্রহণ করেন। এরপর ভাষার দক্ষতা ও উপস্থাপনার চাতুর্যের মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়কে সম্মোহিত করার চেষ্টা চালান। পাঠককে তারা এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এ বিষয়ে তারাই গবেষণার সর্বশেষ অবলম্বন এবং তাদের কথাই চূড়ান্ত কথা। দ্বিতীয়ত, তারা ইসলামি ইতিহাসের কোনো বরেণ্য ও সম্মানিত ব্যক্তিকে তাদের গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেন এবং তার দুর্বলতার জায়গাগুলো চতুরভাবে চিহ্নিত করেন। এরপর পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে তারা বেশ কিছু ভালো দিক তুলে ধরে প্রশংসা করেন। সাধারণ পাঠক লেখকের এই আপাতদৃষ্টির উদারতা ও নিরপেক্ষতায় মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে যান এবং লেখক পরবর্তীতে ওই ব্যক্তির বানোয়াট দুর্বলতার যেসব দিক অনির্ভরযোগ্য সূত্রে তুলে ধরেন সেগুলো মেনে নেন। ফলে প্রাচ্যবিদদের এ জাতীয় রচনা পড়ার পর পাঠকদের হৃদয়ে ইসলামি ইতিহাসের মহান ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামি জ্ঞান ও শাস্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে যায়। তাদের এসব সূক্ষ্ম কৌশল অনেক বরণ্য স্কলারও সহজে ধরতে পারেন না। সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ-এর মতো বিশ্বনন্দিত স্কলার পর্যন্ত বিষয়টি অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'১৯৩৯ সালে বিশিষ্ট মিসরীয় লেখক ড. আহমাদ আমিনের গ্রন্থ ফজরুল ইসলাম (১ খণ্ড) ও জুহাল ইসলাম (৩ খণ্ড) অধ্যয়নের সুযোগ হয়। এটা নবিযুগ এবং

উমাইয়া ও আব্বাসী শাসনামলের চিন্তা, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, নৈতিকতা ও জ্ঞানচর্চার ইতিহাস। লেখক ঘটনাবলির সূত্রে ফলাফল বের করেছেন। ছোট ছোট ঘটনা থেকে মৌলিক দর্শন দাঁড় করিয়েছেন। প্রত্যেক যুগ ও সমকালীন জীবনব্যবস্থার নানা শাখার প্রতি সামষ্টিক দৃষ্টিপাত করেছেন। গ্রন্থদুটি লেখকের শক্তিমান পর্যবেক্ষণ ও বিচারক্ষমতার সুন্দর নমুনা, যদিও সেগুলো বর্তমান কালের আধুনিক ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। লেখকের এই গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে আমাদের হাদিস ভাণ্ডারের প্রতি আস্থা এক রকম নড়বড়ে হয়ে যায়। তাছাড়া হাদিস শাস্ত্রের অনেক কেন্দ্রীয় ব্যক্তির প্রতি যে আস্থা ও শ্রদ্ধা একজন মুসলমানের হৃদয়ে থাকা দরকার তা আর থাকে না। **কিন্তু আমার মনের সরলতা বলুন কিংবা সমালোচক দৃষ্টির দুর্বলতাই বলুন, লেখকের এই ত্রুটি-বিচ্যুতির পূর্ণ অনুভূতি আমার তখন হয়নি। এবিষয়ে আমি সঠিক অনুভূতি ও অবগতি লাভ করেছি এবং প্রকৃত বাস্তবতা জেনে ও বুঝে মর্মাহত হয়েছি ড. মুস্তফা আস-সিবাঈর বিখ্যাত গ্রন্থ *আস-সুন্নাহ ওয়ামাকানাতুহা (সুন্নাহ ও প্রাচ্যবাদ)* অধ্যয়নের পর। হাদিস শাস্ত্রের প্রত্যেক ছাত্রকে এ গ্রন্থ অধ্যয়নের অনুরোধ করছি।'**
[খুতুবাতে আলি মিয়া, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩৯, প্রকাশক: দারুল ইশাআত করাচী, মুদ্রণ: ২০০৩ ঈ.]

উল্লেখ্য, ড. আহমাদ আমিন আরববিশ্বের খ্যাতনামা গবেষক। কিন্তু তিনি প্রাচ্যবিদদের রচনাবলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের কেবল আদর্শরূপে গ্রহণ করেননি, বরং তিনি নিজেও বুঝে বা না বুঝে তাদের হীন চক্রান্তের দাঈ হয়ে গেছেন। পাঠক আমাদের এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে খুব সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারবেন। এমন কৌশলী উপস্থাপনায় তিনি প্রাচ্যবিদদের ভ্রান্ত চেতনাগুলো তার গ্রন্থাবলিতে প্রবেশ করিয়েছেন যে, আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহর মতো বিদ্বান ব্যক্তিও প্রথমে তার দুর্বলতার দিকগুলো ধরতে পারেননি। অবশেষে সঠিক বিষয় বুঝতে পেরেছেন ড. মুস্তফা আস-সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহর এই গ্রন্থের মাধ্যমে।

হ্যাঁ, *সুন্নাহ ও প্রাচ্যবাদ* সেই *আসসুন্নাহ ওয়ামাকানাতুহা* গ্রন্থেরই সমৃদ্ধ অনুবাদ। ড. মুস্তফা আস-সিবাঈ রহ. তার এই গ্রন্থে এমন বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা এবং গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন যা এককথায় অতুলনীয়। হাদিস, সুন্নাহ এবং হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি-তাবিয়িদের ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের আরোপিত অপবাদ ও সংশয়গুলো তিনি এমন দালিলিক ও যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করে প্রকৃত বাস্তবতা ও সত্য তুলে ধরেছেন, যা পাঠ করলে অবশ্যই মুগ্ধ হতে হয়। তাছাড়া ড. সিবাঈর আলোচনার ঋদ্ধতা, গবেষণার উজ্জ্বলতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং উপস্থাপনার ঋজুতা গ্রন্থটিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে। ফলে প্রথম প্রকাশের পর থেকে সমগ্র মুসলিমবিশ্বে এটি আপন বিষয়ে একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। প্রায় শত বছর পরও এর আবেদন, জনপ্রিয়তা ও

উপকারিতা কমেনি। বরং সময়ের পথপরিক্রমায় সংশয়বাদী প্রাচ্যবিদদের হিংস্র থাবায় এর আবেদন ও প্রাসঙ্গিকতা বেড়েই চলেছে। সেই প্রথম প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর কত লক্ষ কপি মুদ্রিত হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আরববিশ্ব থেকে শুরু করে এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে এটি পাঠ্যতালিকাভূক্ত। ইংরেজি, উর্দু থেকে শুরু করে পৃথিবীর বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দুনিয়া জুড়ে সমাদৃত এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক গবেষক আহমাদ রিফআত। ইতোমধ্যে তার কয়েকটি বই সাড়া জাগিয়েছে। অধম সম্পূর্ণ গ্রন্থটির অনুবাদ যথাসাধ্য সম্পাদনা করেছি। যেসব অসঙ্গতি নজরে এসেছে শুধরে দিয়েছি। সাধারণ পাঠকের কথা চিন্তা করে গ্রন্থের ভাষা যথাসম্ভব সহজ, সাবলীল ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য, অনুবাদে মূল গ্রন্থের টীকার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ নতুন টীকাও যুক্ত করা হয়েছে। এতে অনূদিত সংস্করণের উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব টীকা বর্তমান সংস্করণটিকে একটি ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ সংস্করণে পরিণত করেছে। আমার বিশ্বাস—মাদরাসা, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্র থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ গ্রন্থটি থেকে বিপুল উপকৃত হবেন। বিশেষ করে যারা গবেষণা করেন এবং প্রাচ্যবিদদের রচনা অধ্যয়ন করেন তাদের জন্য গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য। যুগোপযোগী এমন গ্রন্থ উপহার দেয়ায় পথিক প্রকাশন পাঠকদের আন্তরিক দুআ পাবেন—ইনশাআল্লাহ।

কোনো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে জানানোর বিনীত অনুরোধ থাকল। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করেন। সকলের কাজকে মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। আমিন!

বিনীত

শাব্বীর মুহাম্মদ
০২/০৭/১৪৪৫ হি.
১৪/০১/২০২৪ ঈ.
shabbir9720@gmail.com

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানুরি রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা

(১৯০৮–১৯৭৭)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد!

নবি ও রাসুল

আদম-সন্তানকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর শুরু থেকেই ওহির ধারা সূচনা করেছেন। প্রত্যেক যুগেই তিনি কয়েকজন পূত-পবিত্র মহামানবকে নির্বাচন করেছেন, যারা সরাসরি ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী মানবজাতিকে জ্ঞানগত শিক্ষা ও কর্মগত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। ইসলামি পরিভাষায় তাদের 'নবি' ও 'রাসুল' বলা হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সরাসরি নির্দেশনা গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ সবধরনের ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা জরুরি। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকেই এই মহান সত্তাদের 'মাসুম' বা নিষ্পাপ হওয়ার শতভাগ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শয়তানের ধোঁকা ও কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে সন্দেহাতীতভাবে পবিত্র। সুরা আন-নাজমের আয়াতানুসারে, নবিগণের মৌখিক বক্তব্য রবের তরফ থেকে আসা ওহিভিত্তিক—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.

'তিনি নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলেন না।'[১]

নবি-রাসুলগণের কর্মও আসমানি ওহিনির্ভর—

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ.

[১] সুরা আন-নাজম (৫৩) : ৩।

‘আমি তো কেবল আমার প্রতি যে ওহি অবতীর্ণ করা হয় তা-ই অনুসরণ করি।’[২]

অপরদিকে মানবজাতির জন্য এই মহান মানুষদের আনুগত্য করা আবশ্যক করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.

‘আমি প্রত্যেক রাসুলকে কেবল এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করা হবে।’[৩]

মুজিজার পরিচয়

নবি-রাসুলগণকে যেসব অকাট্য দলিল ও নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, ইসলামি পরিভাষায় সেগুলোকে ‘মুজিজা’ (এমন প্রমাণ যা মানুষ রদ করতে কিংবা অনুরূপ সৃষ্টি করতে অক্ষম) ও ‘আয়াতে বায়্যিনাত’ (সুস্পষ্ট নিদর্শন) বলা হয়। ‘মুজিজা’ এই কথার প্রমাণ যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিজীবকে পথ দেখাতে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে নবিগণ আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। ‘মুজিজা’র উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির কাছে নবুওতের সত্যতা সুসাব্যস্ত করে দেওয়া, যেন এর বিপরীতে কোনো দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার সুযোগ না থাকে, মানুষ একনিষ্ঠ মনে নবিগণকে সত্যায়ন করতে পারে, তাঁদের ওপর ইমান আনতে পারে।

রবের সকল আদেশ-নিষেধ এবং যাবতীয় ঐশী পথনির্দেশনার ভিত্তি আসলে রবের সাথে ওই ‘সংযোগ ও সম্পর্ক’, যা নবিগণ সরাসরি লাভ করেন, আর সকল সৃষ্টিজীবের লাভ হয় নবি-রাসুলগণের মধ্যস্থতায়। নবি-রাসুলগণ সরাসরি আল্লাহর পয়গাম ও বিধান লাভ করতেন এবং সৃষ্টিজীবের কাছে পৌঁছাতেন।

নবির প্রতি ওহি আগমনের পদ্ধতি

আল্লাহ কখনো সরাসরি নবির অন্তরে স্বীয় পয়গাম ঢেলে দিতেন (النفث في الروع أو الإلقاء في القلب), কখনো ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁদের নিকট পয়গাম পৌঁছাতেন। যে ফেরেশতাকে পয়গাম পৌঁছানোর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল, তার নাম ‘জিবরাইল’। কুরআনে এসেছে,

[২] সুরা আল-আহকাফ (৪৬) : ৯।
[৩] সুরা আস-নিসা (০৪) : ৬৪।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ.

> 'কোনো মানুষের এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে (সামনাসামনি) কথা বলবেন, তবে ওহির মাধ্যমে (বলতে পারেন) অথবা পর্দার আড়াল থেকে কিংবা আল্লাহ (তার নিকট) কোনো বার্তাবাহী (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেবেন, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান (সেই ওহির বার্তা) পৌঁছে দেবে।'[৪]

বার্তাবাহী ফেরেশতা ওহির পয়গাম নিয়ে আসার যে কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে, তা আসমানি সহিফা বা আসমানি কিতাবের অংশ হওয়া জরুরি নয়। বরং কখনো ওহির পয়গাম ফেরেশতা নিজ ভাষায় পৌঁছে দেন, কখনো আল্লাহ তাআলা নবির হৃদয়ে তা ঢেলে দেন।

ওহির যেসব পয়গাম আল্লাহর তরফ থেকেই শব্দাকারে সাজিয়ে ফেরেশতার মাধ্যমে রাসুলগণের নিকট পৌঁছানো হয়েছে, ইসলামি পরিভাষায় এসব পয়গামকে 'ওহিয়ে মাতলু'[৫], 'কালামুল্লাহ' (আল্লাহর কথা), 'কিতাবুল্লাহ' (আল্লাহর কিতাব) ও 'সহিফা' (পুস্তিকা) বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের ওহির পয়গাম আল্লাহর তরফ থেকে শব্দাকারে সাজিয়ে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, উম্মাহ যেন পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি প্রজন্ম সিনায় সংরক্ষণ করতে পারে। আর যেসব পয়গাম ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতীত কিংবা ফেরেশতা নিজ ভাষায় পৌঁছে দেন, সেগুলোকে ইসলামি পরিভাষায় 'ওহিয়ে গাইরে মাতলু'[৬] বলা হয়।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ সহিফাসমূহ এবং চারজন 'উলুল আজ্‌ম' (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) নবির ওপর অবতীর্ণ চার কিতাব তথা তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন 'ওহিয়ে মাতলু'র উদাহরণ।

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন, নবি ও রাসুলগণের সংখ্যা লাখেরও অধিক[৭], সেই তুলনায় সহিফা ও কিতাবের সংখ্যা কিন্তু নিতান্তই কম। আবার এটাও নিশ্চিত

---

[৪] সুরা আশ-শুরা (৪২) : ৫১।

[৫] যে ওহি সালাতে তিলাওয়াত করা হয় এবং যার তিলাওয়াত ইবাদত গণ্য হয় তথা কুরআনের ওহি।

[৬] যে ওহি সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না এবং যার তিলাওয়াত সরাসরি ইবাদত গণ্য হয় না তথা সুন্নাহর ওহি।

[৭] মুসনাদে আহমাদের একটি বর্ণনায় এসেছে, নবিগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। কিন্তু বর্ণনাটির সূত্র দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে নবি-রাসুলগণের সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। দেখুন, 'এসব হাদিস নয়', মাওলানা হুজ্জাতুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ ২/৩৫-৩৬।

যে, সহিফা ও কিতাবের ওহি ছাড়া নবিদের কাছে ওহির আরও পয়গাম এসেছে। আর অনেক নবির ওপর কোনো সহিফা বা কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। অর্থাৎ ওহির এসব পয়গাম কখনো সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, কখনো ফেরেশতা নিজ ভাষায় পৌঁছে দিয়েছেন, কিংবা আল্লাহ নবির অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন।

তাহলে সব নবির যুগে যাবতীয় শরয়ি বিধানের ভিত্তি সহিফা বা কিতাব ছিল না; বরং মানুষের জন্য অনেক বিধানের ভিত্তি ছিল নবি-রাসুলগণের নিষ্পাপ সত্তা। আর উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত কিতাবের ওপর ইমান আনা এবং তা অনুসরণ করা যেমন আবশ্যক, নবি ও রাসুলের প্রতিটি হুকুম মানাও বাধ্যতামূলক। আনুগত্য ও অনুসরণের দিক থেকে নবির মর্যাদা ও অবস্থান কিতাব ও সহিফার মতোই।

সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে কুরআনের ওহি এবং হাদিসের বিধান মানা উভয়টিই সমান মাত্রায় আবশ্যক ছিল।[৮] নবিযুগের পরবর্তী মানুষের জন্য কুরআনের বিধান অকাট্য, হাদিস ও সুন্নাহর বিধান যদি তাওয়াতুরের[৯] মাধ্যমে পৌঁছায়, তাও অকাট্য। আর যেসব হাদিস তাওয়াতুরের সূত্রে পৌঁছায়নি, (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হওয়ার কারণে) কুরআনের বহু আয়াতের আদেশ অনুযায়ী সেগুলোর ওপর আমল করা উম্মতের কর্তব্য।

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

‘রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো আর তোমাদের যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।’[১০]

আরও ঘোষণা দিয়েছে,

قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.

‘(হে নবি! আপনি মানুষকে) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।’[১১]

---

[৮] কুরআন তো অকাট্য ছিলই। আর হাদিস সরাসরি নবিজির মুখ থেকে অথবা অন্য সাহাবির কাছ থেকে শোনার কারণে সেটিও কুরআনের মতোই সাহাবিদের কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ছিল।

[৯] অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে এমন বহু সংখ্যক প্রমাণিত সূত্রে উম্মাহর নিকট পৌঁছে যা বিধানটি মিথ্যা বা ভুল হওয়ার নুন্যতম সম্ভাবনাও নাকচ করে দেয়।

[১০] সুরা আল-হাশর (৫৯) : ৭।

[১১] সুরা আলি ইমরান (৩) : ৩১।

আর এই বাস্তবতাও সর্বজনস্বীকৃত, মানবজাতির জন্য আল্লাহর নির্দেশনা ও বিধানাবলি যেমন কুরআনের অংশরূপে নবিজির ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর বহু বার্তা ও বিধান নবিজির ওপর কুরআন ভিন্ন ওহির মাধ্যমেও অবতীর্ণ হয়েছে, উম্মতকে তা জানানো হয়েছে এবং নবিযুগে আল্লাহর বিধানরূপে তার ওপর আমলও করানো হয়েছে। কুরআনের ভাষায় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রদত্ত আসমানি শিক্ষার নাম হচ্ছে 'আল-হিকমাহ'। এই জন্য কুরআন কয়েক জায়গায় 'আল-হিকমাহ'র জন্যও أَنْزَلَ (আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন) শব্দ ব্যবহার করেছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই মৌলিক বাস্তবতাগুলো বুঝলে এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সহজ হয়, দীনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তা। দীনের উৎসমূল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাবতীয় শিক্ষা ও পথনির্দেশ এবং তাঁর সমুদয় বাণী ও কর্মসমষ্টি; চাই কুরআনে তা উল্লেখিত হোক বা না হোক।

ইসলামি শরিয়াহর রূপরেখা নিয়ে গভীর চিন্তা করলে জানা যায়, শরিয়তের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিধান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বাস্তবায়ন করতেন। আর এ বিষয়ও স্পষ্ট যে, এসব বিধান তিনি আল্লাহপ্রদত্ত কুরআন ভিন্ন ওহির মাধ্যমে জেনেই বাস্তবায়ন করতেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত কুরআনে সেগুলোর উল্লেখ থাকত না, পরবর্তীকালে কুরআনে সেসব বিধান সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হতো। যেন কুরআন নবিজির জারি করা বিধানগুলোর সত্যায়ন করত। নিম্নোক্ত কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এই বাস্তবতা অনেক স্পষ্ট হয়।

১. তাওহিদের বিশ্বাসের পর সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই এই ইবাদত পালনের ধারা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মিরাজের ঘটনার আগে সকাল-সন্ধ্যা দুই ওয়াক্ত সালাত পড়া হতো। মিরাজের পর সালাত পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত কুরআনে না সালাতের ওয়াক্ত-সংখ্যার কথা উল্লেখ ছিল, না সালাত আদায় করার পদ্ধতি ও কাঠামোর বিবরণ ছিল। উম্মাহ এই ফরজ বিধানকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌখিক ও প্রায়োগিক নির্দেশনার অধীনেই গ্রহণ করেছে এবং (কুরআনে এই বিবরণ উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও) আমল শুরু করে দিয়েছে।

২. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

'তোমরা সেভাবে সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায়

করতে দেখো।’[১২]

সালাত আদায়ের পদ্ধতি নবিজি মৌখিক ও প্রায়োগিকভাবে তুলে ধরেছেন। যথা—সালাত ‘আল্লাহু আকবার’ বলে শুরু হয়, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলে শেষ হয়, সালাতের মধ্যে কিয়াম হয় (দাঁড়াতে হয়), কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, রুকু-সিজদা হয়, দুই রাকাত পড়ে বৈঠক হয়, সালাত দুই রাকাত, চার রাকাত বা তিন রাকাত করে হয়। যদিও সত্যায়নের উদ্দেশ্যে কুরআন অল্প অল্প করে এই বিষয়গুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছে, কিন্তু উম্মাহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত ও তার বিস্তারিত বিবরণ রাসুলের মৌখিক ও প্রায়োগিক নির্দেশনার মাধ্যমেই শিখেছে, বুঝেছে এবং আমল করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করেননি, কুরআনের আয়াত নাজিল হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা মওকুফ বা স্থগিত রাখেননি। কুরআনে কারিম শুরুতে হুকুম দিয়েছিল, أَقِيمُوا الصَّلَاةَ (যথাযথভাবে সালাত আদায় করো), রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শিক্ষা ও নির্দেশনামাফিক সালাতের নকশা তুলে ধরেছেন, যার ওপর উম্মাহ আমল করে এসেছে। সালাতের এই বিষয়টি যেন কুরআনের এই আয়াতের বাস্তব ব্যাখ্যা—

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

> ‘(হে নবি!) আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।’[১৩]

৩. সালাত আদায় করার জন্য পবিত্রতা অর্জন এবং ওজু-গোসলের যাবতীয় বিষয় বিস্তারিতভাবে নবিজিই বলে দিয়েছেন। সালাতের কাপড় ও সালাতের স্থান পবিত্র হওয়ার বিধানও তিনিই বর্ণনা করেছেন। উম্মাহ তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করে গেছে। প্রায় ১৮ বছর পর পবিত্রতা অর্জন ও ওজু-সম্পর্কিত সুরা আল-মায়েদার আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই দীর্ঘ সময় নবিজির নির্দেশনা অনুযায়ী উম্মাহ আমল করে এসেছে।

৪. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে মদিনা আগমন করেন, তিনি বাইতুল মাকদিসমুখী হয়ে সালাত আদায় করার আদেশ করেন। ১৬–১৭ মাস এই বিধানের ওপর আমল হওয়ার পর কুরআনে

[১২] সহিহ বুখারি: ৬০০৮।

[১৩] সুরা আন-নাহল (১৬) : ৪৪।

প্রজন্ম ও আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণি—যাদের না আছে ধর্মীয় শিক্ষা, না আছে দীনি দীক্ষা—তারা এই জালে ফেঁসে গেল এবং ইলহাদি ধ্যান-ধারণার শিকার হয়ে গেল।

হাদিস অস্বীকারের সূচনা

হাদিস অস্বীকারের ফেতনা অনেক প্রাচীন। সর্বপ্রথম আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে (সিফফিনের যুদ্ধের পর) 'সালিশ নির্ধারণের' ঘটনায় ইসলামের চূড়ান্ত দুশমন খারেজিরা এই ভিত্তিতে হাদিস অস্বীকার করে বসে, 'সালিশ নির্ধারণ করা এবং (তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর মোকাবিলায়) সালিশের ফয়সালা গ্রহণ করার কারণে সকল সাহাবি কাফের হয়ে গেছেন, আর কোনো বর্ণনা শুদ্ধ হওয়ার প্রথম শর্ত হলো বর্ণনাকারী মুসলিম হওয়া।' এজন্য তারা শুধু কুরআনকে দলিলরূপে গ্রহণ করে এবং কুরআনকেই গোটা দীনের ভিত্তি স্থির করে। কিছুদিন পর, পালটা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খারেজিদের বিপরীতে রাফেজি ও শিয়াদের আবির্ভাব ঘটে। তারা দাবি করে, কুরআনে হ্রাস-বৃদ্ধি ও বিকৃতি ঘটেছে। তারা আহলে বাইতের ইমামদের ছাড়া সকল সাহাবি বর্ণিত হাদিস অস্বীকার করে; গোটা দীনকে ইমামদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বর্ণনা ও তাদের অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলে। অনুরূপ মুসলমানদের মাঝে সর্বপ্রথম বুদ্ধিপূজারি সম্প্রদায় মুতাজিলারাও নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাসের বিপরীত অর্থ বহনকারী সব হাদিসকে (অপব্যাখ্যার মাধ্যমে) অস্বীকার করে। ফলে হাদিস অস্বীকারকারীদের হাত আরও মজবুত হয়।

কিন্তু সেটা ছিল ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তার যুগ। হাদিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, চরম অপতৎপরতা ও রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামার পরও ফেতনাবাজদের সব চাল ব্যর্থ হয়। মুসলিম উম্মাহ যেভাবে পবিত্র কুরআনকে আত্মস্থ করেছেন, হিফজুল কুরআন ও উলুমুল কুরআনের খেদমতকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের চাবিকাঠি মনে করেছেন, তেমনই পবিত্র সুন্নাহ ও নববি হাদিসকেও তারা সম্মানের চূড়ায় স্থান দিয়েছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে হাদিসের খেদমতে তারা গোটা জীবন ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি কথা সংরক্ষণ করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যেকোনো বড় ব্যক্তিত্বের জীবনী উঠিয়ে দেখুন—শুধু নবুওতের ২৩ বছর নয়, বরং জন্মলগ্ন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবিজির গোটা জীবনেতিহাস, নবুওত লাভের আগের ও পরের টুকরো টুকরো ঘটনা এবং প্রবাস-নিবাস ও ঘরে-বাহিরের বর্ণনা এত সবিস্তারে সংরক্ষণ করা হয়েছে; ইতিহাস অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন নজির দেখাতে অক্ষম। বিশ্বনবির জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক, মুহাদ্দিসগণ তাঁর সুনির্মল জীবনের ঘটনা ও মুহূর্তগুলো এমনভাবে

সংরক্ষণ করেছেন, যা দেখে ইসলাম-বিরোধীরাও হতবাক হয়ে যায়।

হাদিসের নামে বর্ণনা জাল করা যেভাবে শুরু হলো

হাদিসে নববি ও পবিত্র সুন্নাহর প্রতি মুসলিম উম্মাহর আছে গভীর আগ্রহ, অনিঃশেষ মুগ্ধতা ও ভালোবাসা। তা দেখে শত্রুরা ইসলামের এই মহামূল্যবান সম্পদ অকেজো করে দেওয়ার আরেকটি ধূর্ত পথ অবলম্বন করে; তারা নিজেদের তৈরি করা নানা বর্ণনাকে সহিহ হাদিস ও বর্ণনার সঙ্গে মিশিয়ে মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। আর বিভিন্ন সময় তারা এটাও ঘোষণা করেছে, 'আমরা এত হাজার জাল হাদিস সহিহ হাদিসের সাথে মিলিয়ে প্রচার করে দিয়েছি, সেগুলো এখন মুহাদ্দিসদের হাদিসের ক্লাসে চর্চা করা হচ্ছে।' তাদের এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির মতলব ছিল, বিশুদ্ধ ও বাতিল বর্ণনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে গোটা হাদিস-ভান্ডারের ওপর থেকে মুসলমানদের আস্থা ও নির্ভরতা উঠে যাবে এবং দীন ইসলামের এই সুদৃঢ় ইমারত জমিনে ধসে পড়বে!

কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় দীন ও সায়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে সংরক্ষণ করা ও স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য এমন কর্মবীর মনীষী সৃষ্টি করে দিলেন, যারা হাদিসের বর্ণনা যাচাই এবং বিশুদ্ধ ও বাতিল বর্ণনা আলাদা করার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র অনেক শাস্ত্র সংকলন করেছেন, যেসব শাস্ত্রের সংখ্যা একশোর কাছাকাছি। পাশাপাশি হাদিস বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই এবং বর্ণনাকারীদের কে নির্ভরযোগ্য আর কে অনির্ভরযোগ্য তা আলাদা করার লক্ষ্যে 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্র সংকলন করেছেন। এই শাস্ত্রের লিটারেচারে তারা হাদিস বর্ণনাকারীদের কে 'সিকাহ' (বিশ্বস্ত), কে 'জয়িফ' (দুর্বল), কে 'কাজ্জাব' (মিথ্যুক) ও 'ওয়াদ্দা' (হাদিসের জাল বর্ণনা তৈরিকারী) ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এভাবে তারা দুধ আর পানি আলাদা করে দিয়েছেন। মুহাদ্দিসগণের এসব শাস্ত্র চর্চার ফলে শত্রুদের শেষ চেষ্টা (পড়ুন ষড়যন্ত্র) ব্যর্থ হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে বিশুদ্ধ হাদিস সংরক্ষিত হওয়ার সহায়ক শাস্ত্রগুলোও অস্তিত্বে আসে।

নিঃসন্দেহে ইসলাম চিরস্থায়ী ধর্ম। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য সঠিক পথের উৎস। তাই আবশ্যক ছিল, ইসলামের দুই মশাল–'কিতাব ও সুন্নাহ' (অন্যভাবে বললে 'কুরআন ও হাদিস') আলোকিত থাকবে; সব ধরনের তুফান, অন্ধকার ও সংকট থেকে সংরক্ষিত থাকবে; যাতে আল্লাহপ্রদত্ত প্রমাণ মানবজাতির সামনে সদা স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান এবং আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকে। কুরআনের এই আয়াত আদম-সন্তানের কানে প্রতিধ্বনি তোলে, অন্তরে

কম্পন সৃষ্টি করে—

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ.

‘তোমরা কীভাবে কুফর অবলম্বন করতে পারো, অথচ তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় এবং তাঁর রাসুল তোমাদের মধ্যে রয়েছেন!’[২৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসেও বলা হয়েছে,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

‘আমি তোমাদের নিকট দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যত দিন তোমরা তা আঁকড়ে থাকবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবির সুন্নাহ।’[২৫]

মোটকথা, কিতাব-সুন্নাহ (কুরআন-হাদিসের) একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়, এটি হবে আল্লাহ থেকে রাসুলকে আলাদা করার নামান্তর। হাদিসে নববিকে অস্বীকার করে কুরআনের ওপর ইমান আনার দাবি করার সুযোগ নেই। অন্যথায় এর অর্থ হবে, আল্লাহর ওপর ইমান আনার দাবি করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করা।

কুরআন বারবার এই ঘোষণা দিয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইমান ও তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণেই মানবতার মুক্তি নিহিত। তাঁর রিসালাতের অস্বীকার, বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করলে মানবতার ধ্বংস সুনিশ্চিত। রাসুলের বিরোধিতা, শত্রুতা ও নাফরমানি করলে কুরআন কঠিন সতর্কবাণী শুনিয়েছে। উম্মতের জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আদর্শ ও নমুনা বানিয়েছে। কুরআন শিক্ষাদান, কুরআনের অর্থ ও মর্ম নির্ধারণ, কুরআনে সংক্ষেপিত বিষয়ের তফসিল বর্ণনা করা, কুরআনের অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করা এবং ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রায়োগিক রূপরেখা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি বলে দেওয়া—এই সবকিছুকেই কুরআন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছে। এমনকি কুরআন রাসুলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসুলের বিরোধিতা ও নাফরমানিকে খোদ আল্লাহর নাফরমানি গণ্য করেছে।

---

[২৪] সুরা আলি ইমরান (০৩) : ১০১।

[২৫] এই হাদিসটির সূত্রে দুই স্থানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। *মুসতাদরাকুল হাকেমে* ইবনু আব্বাস ও মাকিল ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনা এবং *সুনানে বাইহাকি*-তে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা *মুয়াত্তা* কিতাবে বর্ণিত এই হাদিসের বিশুদ্ধতার স্বপক্ষে প্রমাণ, তাই হাদিসটির মূলপাঠ প্রমাণিত। মুওয়াত্তা মালেক, হাদিস নং: ৩৩৩৮।

বরং গভীর চিন্তা করে কুরআন অধ্যয়ন করলে এই ফলাফল বের হয়, মঙ্গল ও সৌভাগ্য এবং মুক্তি ও সফলতা—সবকিছুই রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণেই সীমাবদ্ধ। শুধু তা-ই নয়, আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার ভালোবাসা এবং বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা (বান্দার এই দাবি যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন)—উভয় ভালোবাসার শুদ্ধতার মাপকাঠিও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বলা হয়েছে,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.

> '(হে নবি! আপনি) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন।'[২৬]

যাইহোক, অবস্থা হলো এই যে, খারেজি, রাফেজি, শিয়া, মুতাজিলা, কাদরিয়া, মুরজিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি বাতিল ফেরকা সুন্নাহ ও হাদিসের বিরুদ্ধে যে বিষ প্রয়োগ করেছিল—সব যুগে অবিশ্বাসী, নাস্তিক, খোদাদ্রোহী জিন্দিক ও মুলহিদরা নতুন রূপে সেই বিষ প্রয়োগ করতে থাকে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ির মুজাহিদসুলভ প্রচেষ্টা এবং পরবর্তীকালে কালামশাস্ত্রবিদদের মেহনত বাতিল গোষ্ঠীগুলোকে দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে, দলিল-প্রমাণে নিরুত্তর করে দিয়ে তাদের দুঃসাহস দমিয়ে দিয়েছে।

হাদিসের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের শত্রুতা

ইউরোপের প্রাচ্যবিদরা ক্রুসেড যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়ার পর পুরোনো হাতিয়ার ব্যবহার করেই ইসলামের গোড়া কেটে ফেলতে উদ্যত হয়। তারা ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে 'সাইন্টিফিক রিসার্চ' (ইলমি গবেষণার) মুখরোচক নামের আড়ালে হাদিস ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণ চালায়। প্রাচীন বাতিল গোষ্ঠীগুলো যে বিষ প্রয়োগ করেছিল, সেই বিষ নতুনভাবে বোতলজাত করে 'ইলমি গবেষণা'র লেবেল লাগিয়ে কলেজ-ইউনিভার্সিটির সরলমনা শিক্ষার্থী ও ইসলামি শিক্ষা বঞ্চিত নতুন প্রজন্মকে গেলানোর চেষ্টা করেছে।

কখনো তারা বলে, 'এসব হাদিস তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের দুশো বছর পরে লেখা হয়েছে, এগুলোর কী গ্রহণযোগ্যতা আছে?' কখনো তারা হাদিসের ধারক-বাহক সাহাবায়ে কেরাম, হাদিস বর্ণনাকারী তাবিয়িন

[২৬] সুরা আলি ইমরান (০৩) : ৩১।

এই ছয়টি গ্রন্থ এখনও ছাপেনি। যখন উম্মাহর সামনে এসব সংকলন এবং হাদিস সংরক্ষণের এসব খেদমত এসে যাবে, তখন ইনশাআল্লাহ 'মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া'র উস্তাদগণ ও 'তাখাসসুসে'র তালিবুল ইলমরা রাসুলের সুন্নাহ ও হাদিস সংরক্ষণকারীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবেন। আল্লাহ চাইলে তা কঠিন কিছু নয়।

এই সব মূল্যবান গ্রন্থের মাঝে উস্তাদ মুসতফা হাসানি সিবাঈ রাহিমাহুল্লাহ রচিত *আস সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত-তাশরিয়িল ইসলামী* বইটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকের জন্য পেশ করছি—

বইটির আরবি সংস্করণ এগারো বছর আগে ১৩৮০ হিজরিতে কায়রোতে ছাপা হয়। লেখক ১৩৪৯ হিজরিতে জামেয়া আজহারের কুল্লিয়াতুশ শরিয়ায় এম. এ. ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে বইটি প্রবন্ধাকারে জমা দেন। যা রচনার ত্রিশ বছর পর ১৩৮০ হিজরিতে বই আকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশে দেরি হওয়ার কারণ ভূমিকায় বলা হয়েছে।

বইটি অলংকারপূর্ণ বিশুদ্ধ আরবিতে, মিষ্টি ও হৃদয়স্পর্শী ভঙ্গিতে লেখা। লেখক আপন সময়ের সুযোগ্য বক্তা ছিলেন, প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তিমান কলমের মালিক সাহিত্যিক-ও ছিলেন। একশত প্রাচীন ও বর্তমান নানা উৎসগ্রন্থ সামনে রেখে বইটি রচিত, যেগুলোর তালিকা বইয়ের শেষে দেওয়া হয়েছে। বইটি তিনটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাতটি ও তৃতীয় অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে। পরিশিষ্টে লেখক বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় প্রসিদ্ধ চার মুজতাহিদ ইমাম এবং কুতুবে সিত্তাহর লেখক ছয়জন মশহুর মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করেছেন। সূচিপত্রের শিরোনামগুলোতে সামান্য নজর বুলালেই বইটির কদর বুঝা যায়।

বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য

এই বইয়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টান প্রাচ্যবিদদের সংশ্লিষ্ট আলোচনা ড. মুসতফা সিবাঈর নজিরবিহীন কীর্তি। লেখক গুরুত্ব দিয়ে সবিস্তারে প্রাচ্যবাদের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। ইউরোপের বড় বড় ভার্সিটিতে গিয়ে এই বিষয়ে বৈঠক করেছেন। এমনকি প্রাচ্যবিদদের মহাপণ্ডিত (?) গোল্ড জিহারের প্রতারণা ও মিথ্যাচার, 'সাইন্টিফিক রিসার্চ'-এর নামে ইসলামি ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা, নানা অপরাধ ও অসততা প্রকাশ করে দিয়েছেন; প্রাচ্যবিদদের মুখ থেকেই গোল্ড জিহারের অসততার স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন। এত বিশদভাবে এই আলোচনা

আপনি এই বিষয়ে লিখিত অন্য কোনো বইয়ে পাবেন না। যদি এই বইয়ে এই বিষয়টি ছাড়া আর কিছুই না থাকত, তবুও তা বইটির ইলমি মূল্য বুঝার জন্য যথেষ্ট ছিল। বইয়ের এই অংশ কলেজ-ভার্সিটিতে ইহুদি ও খ্রিষ্টান লেখক-প্রফেসরদের তত্ত্বাবধানে থাকা নওজোয়ান, সরলমনা, দীন সম্পর্কে অনবগত, ইউরোপিয়ান লেখক-গবেষকদের দ্বারা প্রভাবিত প্রজন্মের ইমানি সম্পদ লুটেরাদের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা

আগেই বলেছি, বইটি উঁচুমানের আরবি ভাষায় লেখা। শুধু আরবি জানেন এমন ব্যক্তিবর্গ না, বরং আরবি সাহিত্য ও ইলমের রুচি রাখেন এমন আলেমগণই এই বই থেকে উপকৃত হতে পারেন। 'মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া'র রচনা বিভাগ বইটি অনুবাদের সংকল্প করে, যাতে নতুন প্রজন্ম ও আধুনিক শিক্ষিতরা বইটির মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন। বইটি ইহুদি-খ্রিষ্টান লেখকদের রচনায় ছড়িয়ে থাকা বিষের প্রতিষেধকের কাজ দেয়, আধুনিক চিন্তাধারায় মিশে যাওয়া বিষ ঝেড়ে ফেলে, পুনরায় বিষচক্রে জড়িয়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়।

সন্দেহ নেই, কুরআন ইসলামি শরিয়তের আত্মা, হাদিসে নববি এই আত্মার জন্য দেহসদৃশ। জানা কথা, আত্মার প্রকাশ, দীপ্তি ও উদ্ভাস এবং গঠন ও কর্মক্ষমতা দেহের মাধ্যমেই সম্ভব। এই দিক থেকে কুরআনের বাস্তব ও প্রায়োগিক রূপ কেবল নবিজির পবিত্র জীবন ও হাদিস শরিফের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। আত্মাকে যেমন দেহ থেকে পৃথক করা যায় না, দেহকে আত্মা থেকে আলাদা করা যায় না—তেমনই ইসলামি শরিয়তে কুরআনকে হাদিস থেকে এবং হাদিসকে কুরআন থেকে আলাদা করা যায় না। যে ব্যক্তি হাদিস অস্বীকার করে, সে মূলত কুরআন অস্বীকার করে; সে কাফের ও মুরতাদ। অন্যভাবে বললে, কুরআনকে যদি আত্মা ধরা হয়, তাহলে হাদিস হবে তার ছাঁচ; আত্মা ও ছাঁচ উভয়ের মাধ্যমেই ইসলামি শরিয়ত আত্মপ্রকাশ করে, স্থায়িত্ব লাভ করে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার এই কথার উদ্দেশ্য এটাই ছিল,

كان خلقه القرآن

'তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।'[২৭]

[২৭] আল-আদাবুল মুফরাদ: ৩০৮; মুসনাদু আহমাদ: ২৪৬০১।

এই বিষয়গুলো সামনে রেখে বইটি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনুবাদের জন্য মাওলানা আহমাদ হাসান টুংকিকে নির্বাচন করা হয়, যিনি 'মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া করাচি'র দাওরাপড়ুয়া আলেম ও এম. এ. , পিএইচডি, করাচি ইউনিভার্সিটি। তিনি প্রথমে শব্দানুগ অনুবাদ করেছিলেন, পরবর্তীকালে 'মাদরাসা আরাবিয়া ইসলামিয়া'র 'তাখাসসুস ফিল হাদিসে'র উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ ইদরিস মিরাঠি সাহেব পুরো বইটি সম্পাদনা করেন। ফলে বইয়ের ভাষা সাবলীল, প্রাঞ্জল ও গতিশীল হয়েছে। প্রথম খণ্ড এখন পাঠকের সামনে। দ্বিতীয় খণ্ডের কাজও শুরু হয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই পাঠকের সামনে চলে আসবে। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা এই খেদমতকে কবুল করেন।

وصلى الله على خير خلقه صفوة البرية سيدنا محمد وآله وصحبه

প্রাক্‌কথন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرع الأحكام لعباده بكتاب مبين، وأناط تفصيل أحكامه بخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وصحبِه نقلةِ الوحي والأمناءِ على الحق والدعاةِ إلى الله على هدى وصراط مستقيم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

আমরা এমন একটি সময় পার করছি, যখন গোটা বিশ্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাত চলমান, যে মতাদর্শগুলো বিশ্বমানবতার শান্তি ও কল্যাণ অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়েছে। আমরা যতই বলি, আজকের এই সংঘাত মূলত প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর নেতাদের হাজারটা অপকর্মের ফল। কিন্তু সন্দেহ নেই, পৃথিবীর এই অধঃপতনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সেসকল মতাদর্শই দায়ী, যা আজও মানবতার মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপযুক্ত প্রমাণিত হয়নি। মানবতাকে যুদ্ধবিগ্রহ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পৃথিবীজুড়ে যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে তা দূর করতে পারেনি। আর যুদ্ধকালীন সময়ে তো হত্যাযজ্ঞ, ক্ষয় ও ধ্বংসলীলার এক নিকষ আবর্তে ঢাকা ছিল গোটা পৃথিবী।[২৮]

আমরা মুসলমান। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান বিশ্ব শান্তি ও কল্যাণপিয়াসি হলে আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষার দিকেই ফিরে আসতে হবে; যা দিনের আলোর ন্যায়

[২৮] লেখক এই ভূমিকা লিখেছেন ১৯৪৯ সালে। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পঞ্চম বছর। লেখক বুঝাতে চেয়েছেন, ক্যাপিটালিজম কিংবা কমিউনিজম কোনো মতবাদই যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারেনি। ডেমোক্রেসির মতো রাজনৈতিক মতাদর্শ পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কখনোই সক্ষম হয়নি।

পরিষ্কার, সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, তামাশা-জালিয়াতি ও বিকৃতি থেকে চিরমুক্ত। ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষার সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, সূক্ষ্ম এবং প্রশস্ত রূপ; যা যুগের সকল উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, দেশ ও জাতির ভিন্নতা সত্ত্বেও যার আলোকে মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎসগুলো এবং শরিয়তের প্রাজ্ঞ ফকিহ ও আলিমগণের আলোচনার দিকে তাকালে স্পষ্ট যে, ইসলামি শরিয়ত যথেষ্ট প্রশস্ত; প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণের উপাদান শরিয়তে আছে। ফলে তা সবধরনের সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা রাখে এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও শাসক—সকল শ্রেণির জন্য ইসলাম ইনসাফ ও ন্যায় নিশ্চিত করে। একটি অনুগত, উন্নত, বিচক্ষণ ও অগ্রগতির প্রতি উৎসুক জাতির জন্য এবং বিশ্বের সকল প্রান্তের বাসিন্দাদের জন্যও ইসলামি শরিয়ত ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পথ দেখায়; যে রাষ্ট্র উপযুক্ত সন্ধিকামী শ্রেণির সাথে সন্ধি স্থাপন করে, কিন্তু কোনো পাপিষ্ঠ সীমালঙ্ঘনকারী কিংবা কোনো ধোঁকাবাজ দীনবিদ্রোহী ব্যক্তি আকিদা-বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা ও সত্যিকারের স্বাধীনতাকে আক্রমণ করতে চাইলে যে রাষ্ট্র এই মূল্যবোধগুলো রক্ষার জন্য সিসাঢালা প্রাচীরের রূপ নেয়।

ইসলামি শরিয়তের উৎসগুলো সকল মুসলিমের কাছেই সুপরিচিত, সুসংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য। বলা বাহুল্য, ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস পবিত্র 'সুন্নাহ'র শাখাপ্রশাখা সবচেয়ে বিস্তৃত, নানা সমস্যা সমাধানে 'সুন্নাহ'র ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআনে শরিয়তের প্রায় সকল মৌলিক বিধান ও সাধারণ মূলনীতির সমাবেশ ঘটেছে, ফলে কুরআন চিরন্তন সত্যের মতো চিরস্থায়ীরূপে ভাস্বর হয়ে আছে। 'সুন্নাহ' কুরআনে বলা প্রধান মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক রূপ এবং কুরআনের মৌলিক বিধানগুলোর নানা শাখাপ্রশাখার বয়ান হাজির করেছে। সুন্নাহকে গভীরভাবে পাঠ করেছেন এমন ব্যক্তিমাত্রই বিষয়টি অবগত আছেন। এজন্য সব যুগেই ইসলামের ইমামগণ সুন্নাহকে পরম আস্থা ও নির্ভরতার সাথে গ্রহণ করেছেন, নিত্যনতুন উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে অবিকল্প হিসেবে সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানগুলোর আশ্রয় নিয়েছেন এবং সুন্নাহর মাঝেই সমাধান খুঁজে পেয়েছেন।

অতীতে দেখা গেছে, নানা সংশয়ের বশবর্তী হয়ে কিছু ইসলামপন্থী গোষ্ঠী সুন্নাহর ওপর হামলা করেছে। এই দলগুলো সবক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ ছিল না। দলীয় নেতাদের তৈরি করা সংশয়ের জবাব অনুসারীদের কাছে ছিল না। বর্তমানেও কিছু গোঁড়া প্রাচ্যবিদ সুন্নাহকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছে। জানা কথা, প্রাচ্যবিদরা মূলত সাম্রাজ্যবাদ ও মিশনারি কাজের তল্পিবাহক। তাদের একমাত্র লক্ষ্য, মুসলমানদের

মাঝে অস্থিরতা তৈরি করা এবং ইসলামি শরিয়তের এই মজবুত ভিতকে ধ্বংস করে দেওয়া।

কিন্তু আফসোস! আমাদের কিছু অদূরদর্শী লেখকও প্রাচ্যবিদদের অনুসরণ করেছেন। তারা মূলত প্রাচ্যবিদদের নানা চাকচিক্যময় গবেষণার ফাঁদে আটকা পড়েছেন, যেগুলো নিরপেক্ষ বাস্তবধর্মী পর্যালোচনার সামনে ধোপে টেকে না। কিংবা তারা প্রবৃত্তির চাহিদা ও চিন্তাগত সংশয়ের জালে আটকা পড়েছেন। সালাফে সালেহিন রচিত মৌলিক গ্রন্থসমূহ এবং আস্থাভাজন আলিমদের সুচিন্তিত গবেষণার কষ্টিপাথরে এসব সংশয় তারা যাচাই করে দেখেননি। ফলে সুন্নাহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের জঘন্য চিন্তা তাদের শূন্য হৃদয়ে সহজেই অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে। তারা প্রাচ্যবিদদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেছেন। তাদের অবস্থা সেই আরব কবির মতোই, যিনি বলেছেন,

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهَوَى فَصَادَفَ قَلْباً خَالِياً فَتَمَكَّنَا.

> ‘প্রিয়ার ভালোবাসা এলো আমার কাছে এমন সময়ে, যখন আমি ভালোবাসা কী তা জানতাম না; ফলে প্রিয়ার ভালোবাসা আমার শূন্য হৃদয়ে বাসা বেঁধে নিল।’[২৯]

এই মানসিকতার লেখকদের মন-মগজ প্রাচ্যবিদদের ধারণাপ্রসূত গবেষণা ও বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় আটকা থাকে। ১৩৫৮ হিজরির কথা, এমন একজন লেখকের সাথে আমার কথাবার্তা হয়। তাদের সেইসব অবাস্তব ধারণা ও বিভ্রান্তির খণ্ডনমূলক আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে কিছুটা বেগ পোহাতে হয়েছিল। মূলত তখনই আমি ‘ইসলামি শরিয়তে সুন্নাহর মর্যাদা’ বিষয়ে বই লেখার সিদ্ধান্ত নিই। যুগে যুগে সুন্নাহ যেসব ঐতিহাসিক পর্ব পার করে এসেছে এবং সুন্নাহকে রক্ষায় প্রতিযুগে ইসলামের ইমামগণ যে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা নিয়ে বইটিতে আলোচনা করেছি। অতীত ও বর্তমানে সুন্নাহর ওপর হামলাকারীদের শান্তভঙ্গিতে ইলমি ভাষায় জবাব দিয়েছি, যাতে সত্য স্পষ্ট হয়, পবিত্র সুন্নাহর স্বরূপ সমুজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়।

বইয়ের শেষদিকে মুজতাহিদ ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেছি, যারা ছিলেন ইসলামের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আলেম। কারণ, সুন্নাহ সংরক্ষণ ও সংকলনে মুহাদ্দিসগণের সমুজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। সুন্নাহর ওপর নির্ভর করে শরয়ি বিধান বর্ণনা ও উদ্‌ঘাটনে ফকিহগণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

বইটিকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি এবং একটি পরিশিষ্ট যোগ করেছি।

---

[২৯] আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়িন, জাহিয: ২/২৯।

প্রথম অধ্যায়: সুন্নাহর অর্থ, বর্ণনা ও লেখার ইতিহাস

এই অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ আছে—

প্রথম পরিচ্ছেদ: সুন্নাহর অর্থ ও পরিচয়, সুন্নাহ প্রসঙ্গে সাহাবিগণের অবস্থান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সুন্নাহর নামে বর্ণনা জাল করার সূচনা কখন থেকে? কোথায় এবং কীভাবে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সুন্নাহকে জাল বর্ণনা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে উম্মাহর ইমামগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইমামগণের প্রচেষ্টার সুফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সুন্নাহ-কেন্দ্রিক সংশয়-সন্দেহ ও বাড়াবাড়ি।

এই অধ্যায়ে সাতটি পরিচ্ছেদ আছে—

প্রথম পরিচ্ছেদ: সুন্নাহ সম্পর্কে শিয়া ও খারেজিদের মত পর্যালোচনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সুন্নাহ সম্পর্কে মুতাজিলা ও কালামশাস্ত্রবিদদের মত পর্যালোচনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নিকট অতীতে যারা সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকার করেছে তাদের খণ্ডন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বর্তমান সময়ে যারা সুন্নাহর প্রামাণ্যতা অস্বীকার করেছে তাদের খণ্ডন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: যারা 'খাবারুল ওয়াহিদ' বা একক সূত্রে বর্ণিত হাদিসের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করে তাদের খণ্ডন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সুন্নাহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের তৈরি করা সংশয়-সন্দেহ খণ্ডন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: সুন্নাহ সম্পর্কে সমকালীন কিছু লেখকের বিভ্রান্তি।

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামি শরিয়তে সুন্নাহর অবস্থান

এই অধ্যায়ে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে—

প্রথম পরিচ্ছেদ: কুরআনুল কারিমের সাথে সুন্নাহর সম্পর্ক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআন কীভাবে সুন্নাহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কুরআনের কোনো আয়াত দ্বারা সুন্নাহর কোনো বিধান কিংবা সুন্নাহর কোনো বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনের কোনো বিধান রহিত হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা।

পরিশিষ্ট

মুজতাহিদ চার ইমাম ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের জীবনী, যারা ছিলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ আলিম। তারা হলেন—

১. ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৫০ হিজরি)

২. ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ১৭৯ হিজরি

৩. ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২০৪ হিজরি)

৪. ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৪১ হিজরি)

৫. ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৫৬ হিজরি)

৬. ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৬১ হিজরি)

৭. ইমাম নাসায়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৩০৩ হিজরি)

৮. ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৭৫ হিজরি)

৯. ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২৭৯ হিজরি)

১০. ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ (২৭৩ হিজরি)

সবশেষে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করেন, আমাকে সঠিক পথ দেখান, আমার জন্য তার রহমতের ভান্ডার খুলে দেন, আমাদেরকে কুরআনে বর্ণিত সেই দলভুক্ত করেন; যারা প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে সর্বোত্তম কথাটির অনুসরণ করেন। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

মুসতফা সিবাঈ
কায়রো, ৬ই রজব ১৩৬৮
৪ঠা মে ১৯৪৯

লেখকের কথা

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম এবং সুন্নাহর ধারক-বাহক ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা সুন্নাহর প্রতিরক্ষায় ভূমিকা রাখবেন তাদের সকলের ওপর।

যে গ্রন্থ আজ আমি প্রেসে দিচ্ছি, তা মূলত একটি প্রবন্ধ ছিল। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৬৮ হিজরিতে 'ফিকহ, উসুলে ফিকহ ও ইসলামি শরিয়ার ইতিহাস' বিষয়ে 'এম. এ. ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি' লাভের জন্য এই প্রবন্ধটি আমি জামিয়া আজহারের শরিয়া অনুষদে জমা দিয়েছিলাম। নানা কারণে এখন পর্যন্ত আমি এই প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা থেকে বিরত ছিলাম। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, এক কঠিন সংকটাপন্ন অবস্থায় আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। সংগত কারণেই তখন আমি বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিশদভাবে করতে পারিনি; বরং সংক্ষেপে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছি। অথচ আমি জানতাম, ওই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে লিখলে এবং অধিক পরিমাণ দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ উল্লেখ করলে এই গ্রন্থ অনেক উপকারী হতে পারে। তখন সুন্নাহ সংশ্লিষ্ট সব দিক স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। তা ছাড়া আমি এই বিষয়-সংশ্লিষ্ট আরও কিছু আলোচনা যোগ করা আবশ্যক মনে করেছিলাম।

যাইহোক, আমি যা করতে চাচ্ছিলাম তার জন্য আমার সময়-সুযোগ হয়ে উঠছিল না। এরপর হলো কি, এই প্রবন্ধের কিছু অংশ কায়রো, দামেশক থেকে প্রকাশিত ধর্মীয় ও গবেষণামূলক পত্রিকায় ছাপা হয়।[৩০] তখন পাঠকদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দাবি আসতে থাকে। তারপরও আমি আমার

[৩০] কায়রোতে অধ্যাপক মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীবের পত্রিকা 'আল-ফাতাহ' এবং দামেস্কে 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকায় ছাপা হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও বিশদ বিবরণ ও কিছু কিছু সংযোজন করার অপেক্ষায় তা ছাপতে গড়িমসি করছিলাম।

গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণা

আমার এই গড়িমসির সময়ের মধ্যেই আবু রাইয়ার *আদওয়া আলাস সুন্নাতিল মুহাম্মদিয়া* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তার এই গ্রন্থে সুন্নাহ ও সুন্নাহর বর্ণনাকারীদের নিয়ে জ্ঞানগত মানদন্ডে অনুত্তীর্ণ যে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা সবারই জানা আছে। তখন আমাদের বন্ধুরা আমার লেখা প্রবন্ধের আলোচনাগুলোর প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেন এবং আমাকে তা প্রকাশ করতে বাধ্য করেন। তাই একান্ত বাধ্য হয়ে যেভাবে এই প্রবন্ধ লেখা ছিল সেভাবেই এখন উল্লেখ করছি। তবে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সংশ্লিষ্ট আলোচনাটি এখানে সংযোজন করেছি। এই সংযোজন মূলত আবু রাইয়া হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর যে আপত্তি করেছে, তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী, সুস্থতা যদি আমার সঙ্গ দান করে, তাহলে আমার আশাও পূর্ণ হয়ে যাবে। আমার লিখিত গ্রন্থটিকে যেরূপ পেতে চাই, তেমন পাওয়ার সৌভাগ্য হবে, ইনশাআল্লাহ।

আবু রাইয়ার গ্রন্থের পর্যালোচনা

এখানে আমি আবু রাইয়ার গ্রন্থের ওপর কিছু পর্যালোচনা করা আবশ্যক মনে করছি।

প্রথম পর্যালোচনা : ইসলামি আইনে সুন্নাহর মর্যাদা

ইসলামি শরিয়তে সুন্নাহর গুরুত্ব এবং ফিকহে ইসলামিতে সুন্নাহর প্রভাব নবিযুগ ও সাহাবাযুগ থেকে মুজতাহিদ ইমামদের যুগ ও ইজতিহাদি মাজহাব স্থির হওয়া পর্যন্ত এমন অবস্থানে আছে, যা কারও কাছে অস্পষ্ট নয়। সুন্নাহ ফিকহে ইসলামির দ্বিতীয় প্রধান উৎস হওয়ার ফলে তা এমন আইনী সম্পদে পরিণত হয়েছে—অতীত ও বর্তমান কোনো জাতির আইনের ইতিহাসে যার কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। যিনি কুরআন-সুন্নাহ তুলনামূলক অধ্যয়ন করবেন, তিনি জানতে পারবেন, ইসলামি শরিয়তের ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতার রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং শরিয়তের মহত্ত্ব ও অমরত্বে সুন্নাহর অবদান সবচেয়ে বেশি। ফিকহ ও ফিকহি মাজহাব সম্পর্কে অবগত কোনো ব্যক্তিই এই স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে না। মূলত ইসলামি শরিয়ত সেই সুমহান আইন, যার সামগ্রিকতা ও

মাহাত্ম্য সমগ্র পৃথিবীর সমুদয় অঞ্চলের আইন পণ্ডিতদের মাথানত করে দিয়েছে। আর ইসলামি আইনকে যখন বর্তমান যুগের মানুষের নিকট পরিচিত ধারাক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা হবে, তখন ওই পণ্ডিতদের চোখে তা আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইসলামি আইন বিন্যস্তকরণ প্রক্রিয়া

আর বর্তমানে দামেশক ইউনিভার্সিটির কুল্লিয়াতুশ শরিয়া, তথা শরিয়া ল' কলেজের অধীনে মাউসুআতুল ফিকহিল ইসলামি (ইসলামি আইন বিশ্বকোষ) নামে ইসলামি আইনকে প্রচলিত ধারাক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করার কাজ পুরোদমে চলছে।

যুগে যুগে সুন্নাহর বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণ

সুন্নাহর এই ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতাই অতীত এবং বর্তমানে ইসলামবিদ্বেষীদের সুন্নাহর ওপর চতুর্মুখী আক্রমণ এবং সুন্নাহর প্রামাণ্যতায় সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং করছে। সেইসঙ্গে সাহাবি ও তাবিয়িদের মধ্য থেকে যারা সুন্নাহ সংরক্ষণ করছেন এবং হাদিস বর্ণনা করছেন—তাদের সততা, বিশ্বস্ততা এবং হাদিস মুখস্থ ও সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে নানা সংশয়-সন্দেহের বীজ বপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং করছে। আর এই বিদ্বেষমূলক উদ্দেশ্যে ইসলামি সভ্যতার উজ্জ্বল সময়ের ইসলামবিদ্বেষী সকল সম্প্রদায়, বিশেষত পারস্য ও অন্যান্য এলাকার নাস্তিক এবং বর্তমান সময়ের ইসলামবিদ্বেষী চক্র, আরও বিশেষ করে প্রাচ্যবিদ ও তাদের দোসর পশ্চিমা সভ্যতার লেখক ও কলামিস্টরা এক ও অভিন্ন অবস্থানে আছে। সুন্নাহর বিরোধিতা এবং সুন্নাহবিদ্বেষীদের চক্রান্ত নতুন কিছু নয়; বরং তা চৌদ্দশত বছর যাবৎ চলে আসছে। যত দিন ইসলামের দুশমন এই পৃথিবীতে থাকবে, তত দিন ইসলামের দীপ্তিময় আলোকরশ্মিতে তাদের চোখ জ্বালাপোড়া করবে। যত দিন তারা তাদের হৃদয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ক্রোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে থাকবে, তত দিন এই ধারা চলতেই থাকবে।

এই ইসলামবিদ্বেষীরা তো সব সময় তাদের এই অন্ধ ও মূর্খতাসুলভ গোঁড়ামির কারণে ইসলামের কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদকে ধ্বংস করে দিতে চায়। ইসলামের ঝান্ডা যে-ই উত্তোলন করুক, চাই তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হন, কিংবা তাঁর সাহাবি অথবা সুন্নাহ ও শরিয়তের ধারক-বাহক হাদিসের বর্ণনাকারী হন, কিংবা মুজতাহিদ উলামায়ে কেরাম—এই বিদ্বেষীরা তাদের প্রত্যেকের সত্তাকে কলুষিত করার অপচেষ্টা করে এবং ইসলামি সভ্যতা ও ইতিহাসকে নষ্ট করার অপপ্রয়াস চালায়।

কোনো সন্দেহ নেই, ইসলাম ও তার প্রতিপক্ষের মধ্যে যে লড়াই চলমান, তা পূর্বের ন্যায় বর্তমানেও দুশমনদের পরাস্ত করে ছাড়বে এবং তাদের অন্তরের লুকিয়ে থাকা অসদুদ্দেশ্য অচিরেই প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর ইসলাম এমন এক উচ্চ পাহাড়ের মতো স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে, যার ওপর দিয়ে বালুর তুফান ও লু হাওয়া উড়ে একাকার হয়ে যায়। কারণ, ইসলাম ও তার প্রতিপক্ষের মধ্যকার লড়াই মূলত সত্য ও প্রবৃত্তির সংঘাত, ইলম ও মূর্খতার সংঘাত, বদান্যতা ও হিংসার সংঘাত, আলো ও অন্ধকারের সংঘাত। আর জীবনে এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধান হলো—সত্য, ইলম, বদান্যতা ও আলো সব সময় বিজয়ী হয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ.

‘বরং আমি সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি। অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন করে যায়।’[৩১]

দ্বিতীয় পর্যালোচনা : ‘মিথ্যা’ গবেষণার বেড়াজাল

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে ইসলামবিদ্বেষীদের পথে হাঁটছে একদল আলেম ও লেখক। তারা মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে আমরা সন্দেহ করি না, তবে তারা প্রাচ্যবিদ এবং পশ্চিমা গবেষক ঐতিহাসিকদের ‘মিথ্যা’ গবেষণা ও (বাহ্যিক) জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত—যার প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তারা গোপন রাখে। ফলে আমাদের কিছু লেখক মুসলিম হয়েও জেনে বা না-জেনে তা-ই করতে উদ্যত, যার জন্য ওই ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাম্রাজ্যবাদীরা অবিরাম চেষ্টা-সাধনা করে চলছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে ইসলাম ও মুসলিমদের মাঝে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি, মন্দ ধারণা ও খেয়ানত করা-সহ অন্যান্য প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে। আর এভাবেই তারা ইসলামের দুশমনদের সাথে একই প্লাটফর্মে মিলিত হয়; যাদের না জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমি-তাহকিকি ময়দানে কোনো মূল্য আছে, আর না ইতিহাসের দিক থেকে তাদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা আছে।

জালে আটকে যাওয়ার কি কারণ?

এই বাস্তবতাও সামনে রাখা উচিত যে, মুসলিম লেখকদের মধ্য থেকে যারা প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিক ও ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা লেখকদের ফাঁদে পা দেয়, তারা নিম্নোক্ত চারটির কোনো এক কারণে তাদের দ্বারা ধোঁকা খায়:

[৩১] সুরা আল-আম্বিয়া (২১) :১৮।

প্রথম অধ্যায়

সুন্নাহর অর্থ, বর্ণনা ও লেখার ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ: সুন্নাহর অর্থ ও পরিচয় এবং সুন্নাহ প্রসঙ্গে সাহাবিগণের অবস্থান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সুন্নাহর নামে বর্ণনা জাল করার সূচনা কখন থেকে? কোথায় এবং কীভাবে?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সুন্নাহকে জাল বর্ণনা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে উম্মাহর ইমামগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইমামগণের প্রচেষ্টার সুফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুন্নাহর অর্থ ও পরিচয় এবং সুন্নাহ প্রসঙ্গে সাহাবিগণের অবস্থান

সুন্নাহর প্রথম অর্থ

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়,

> ما أُثِرَ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقِيَّة أو خُلُقِيَّة أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها.
>
> ‘সুন্নাহ হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত উক্তি, কর্ম, সাহাবিদের কোনো কাজের স্বীকৃতি, নবিজির দেহ মোবারকের আকৃতি অথবা তাঁর কোনো গুণ বা স্বভাব; চাই তা নবুওতের পূর্বের হোক বা পরের হোক।’[৫৩]

এই অর্থে কারও কারও মতে, সুন্নাহ ও হাদিস সমার্থবোধক।[৫৪]

উসুলবিদগণের পরিভাষায়,

> ما نقل عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
>
> ‘সুন্নাহ বলা হয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত কোনো উক্তি বা কোনো কর্ম কিংবা সাহাবিদের কোনো কাজের স্বীকৃতিকে।’

---

[৫৩] কাওয়াইদুত তাহদিস, জামালুদ্দিন কাসিমি: ৩৫–৮২; তাওজিহুন নজর, তাহের জাজায়িরি, পৃষ্ঠা: ২।

[৫৪] ‘সুন্নাহ’ ও ‘হাদিস’ এই দুটি পরিভাষার একাধিক ব্যবহার যথাযথ উদ্ধৃতিসহ দেখুন— আল-ওয়াজীয ফি শাইইম মিন মুসতালাহিল হাদিসিশ শারিফ, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, পৃষ্ঠা: ৩৫–৮৭। এই আলোচনায় সালাফের ইমামগণের বক্তব্য থেকে ‘সুন্নাহ’ শব্দটির সাতটি ব্যবহার এবং ‘হাদিস’ শব্দটির পাঁচটি ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

উক্তিমূলক সুন্নাহর উদাহরণ হলো বিধান-সম্পর্কিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন সময়ের উক্তি, যেমন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

'নিশ্চয়ই আমলের ফলাফল নির্ভর করে মানুষের উদ্দেশ্যের ওপর।'[৫৫]

উক্তিমূলক সুন্নাহর আরেকটি উদাহরণ,

البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

'ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত লেনদেন বাতিল করার কিংবা বহাল রাখার অধিকার উভয়েরই আছে।'[৫৬]

কর্মগত সুন্নাহর উদাহরণ হলো ইবাদত ও অন্যান্য বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেসব কর্ম সাহাবিগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন—সালাত আদায়, হজের পদ্ধতি, সিয়ামের আদবসমূহ, সাক্ষী ও হলফ দ্বারা বিচারকার্য সম্পন্ন করা ইত্যাদি।

সাহাবিদের কোনো কাজের স্বীকৃতিগত সুন্নাহ দুই ধরনের:

১. সাহাবিগণের যেসকল কাজ নবিজির সামনে প্রকাশ পেয়েছে, তিনি সে ব্যাপারে নীরব ছিলেন এবং বুঝা গেছে, তিনি এতে সন্তুষ্ট বলেই নীরব ছিলেন।

২. বা সে কাজটি তিনি ভালো বলেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন।

প্রথমটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে বনু কুরায়জার ঘটনা। সে ঘটনায় আসরের সালাত-সংক্রান্ত নবিজির নির্দেশনা অনুধাবনে সাহাবিগণের মতপার্থক্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহাল রেখেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণকে বলেছিলেন,

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدَكُمْ العَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

'বনু কুরায়জায় না পৌঁছে তোমরা কেউ আসরের সালাত পড়বে না।'[৫৭]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কেউ এ নিষেধাজ্ঞা বাহ্যিক মর্মে গ্রহণ করলেন। তাঁরা বনু কুরায়জায় পৌঁছে আসরের সালাত কাজা পড়লেন মাগরিবের পর। আবার তাদের কেউ কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আদেশের এ মর্ম গ্রহণ

[৫৫] সহিহ বুখারি : ১; সহিহ মুসলিম : ১৯০৭।
[৫৬] সহিহ বুখারি : ২০৭৯; সহিহ মুসলিম : ১৫৩২।
[৫৭] সহিহ বুখারি : ৯৪৬; সহিহ মুসলিম : ১৭৭০।

করলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত তাদের দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কাজেই তারা যথাসময়ে আসর পড়ে নিলেন। দু-পক্ষের ঘটনাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রুতিগোচর হলো। তিনি উভয় পক্ষের মতই বহাল রাখলেন; কোনো দলের মতের ওপর আপত্তি করেননি।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হলো, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণিত একটি ঘটনা। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে 'দব' নামক গুইসাপ সদৃশ একটি প্রাণীর গোশত হাজির করা হলো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলেন, কিন্তু নবিজি হাত গুটিয়ে নিলেন। কোনো এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! 'দব' খাওয়া কি হারাম? তিনি বললেন,

لاَ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ.

'হারাম নয়, তবে এটি আমাদের এলাকায় পাওয়া যায় না, তাই খেতে ভালো লাগছে না।'[৫৮]

সুন্নাহর দ্বিতীয় অর্থ

আলিমগণ আরেকটি অর্থে সুন্নাহ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। সেটি হলো, শরয়ি দলিলের মাধ্যমে যা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা-ই সুন্নাহ; চাই তা কুরআন অথবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস কিংবা সকল সাহাবির ঐকমত্যপূর্ণ প্রমাণসিদ্ধ রায়ের দ্বারা সাব্যস্ত হোক।

উদাহরণত—কুরআনকে গ্রন্থাকারে সাজানো, সকল মুসলমানকে এক কিরাআতে কুরআন পড়ার ফরমান জারি করা, ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা নথিপত্রের ব্যবস্থা করা।

'সুন্নাহর বিপরীত শব্দ হলো 'বিদআহ'।

'সুন্নাহ'র উক্ত অর্থের একটি ব্যবহার হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের বাণী—

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي.

'আমার সুন্নাহ এবং আমার পর খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা তোমাদের ওপর আবশ্যক কর্তব্য।'[৫৯]

---

[৫৮] সহিহ বুখারি : ৫৩৯১; সহিহ মুসলিম : ১৯৪৫।

[৫৯] আল-মুওয়াফাকাত, শাতিবি: ৪/৬; সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৭; সুনানুত তিরমিজি ২৬৭৬, ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সুন্নাহর তৃতীয় অর্থ

ফকিহগণের পরিভাষায় 'সুন্নাহ' হচ্ছে, যা ফরজও নয়, ওয়াজিবও নয়; বরং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত শরয়ি হুকুমের পাঁচটি স্তরের[৬০] একটি স্তর। ফকিহগণ কখনো 'সুন্নাহ' শব্দটি 'বিদআত'-এর বিপরীতেও ব্যবহার করে থাকেন। যেমন বলা হয়,

طَلَاقُ السُّنَّةِ كَذَا، وَطَلَاقُ البِدْعَةِ كَذَا.

'সুন্নাহসম্মত তালাক এরূপ, আর বিদআতি তালাক এরূপ।'[৬১]

'সুন্নাহ' শব্দের এই পারিভাষিক ভিন্নতার মূল কারণ হলো, প্রত্যেক শাস্ত্রবিদ নিজ নিজ শাস্ত্রে যে দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহর আলোচনা করে থাকেন, সেই বিবেচনায় সুন্নাহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই সেই পথপ্রদর্শক, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি হলেন আমাদের সর্বোত্তম আদর্শ ও উত্তম নমুনা—মুহাদ্দিসগণ সুন্নাহ চর্চা করেছেন এই দিক বিবেচনায়। ফলে তাঁর কথা, কাজ, গুণাবলি, দৈহিক গঠন—মোটকথা নবিজির সাথে সম্পৃক্ত যা কিছুই পেয়েছেন সবই আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাগুলো দ্বারা কোনো শরয়ি বিধান সাব্যস্ত হলো কি না, এটি তাদের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল না।

উসুলের আলিমগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন একজন শরিয়তপ্রবর্তক হিসেবে। যিনি পরবর্তী মুজতাহিদগণের জন্য মূলনীতি স্থির করেছেন এবং মানবজাতির জন্য জীবন-সংবিধান বয়ান করেছেন। তাই উসুলবিদ আলিমগণের সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল রাসুলের সেই উক্তি, কর্ম ও স্বীকৃতিমূলক সুন্নাহ চর্চা করা, যার মাধ্যমে শরয়ি বিধান সাব্যস্ত হয়।

অন্যদিকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কাজই কোনো-না-কোনো শরয়ি বিধান প্রমাণ করে। ফকিহগণের লক্ষ্য ছিল বান্দার বিভিন্ন কর্ম সম্পর্কে শরয়ি বিধানের স্তর বিন্যাস করা—অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্ত কর্ম কি ওয়াজিব, না হারাম, না মুবাহ, না অন্য কিছু।

উসুলবিদ আলিমগণের পরিভাষার 'সুন্নাহ'-কে নিয়েই আমাদের এই গ্রন্থের আলোচনা সীমাবদ্ধ। কেননা তাদের সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী সুন্নাহর যে মর্ম দাঁড়ায়, সেই সুন্নাহর প্রামাণ্যতা এবং শরিয়ত প্রণয়নে এর কী মর্যাদা সেটিই সাধারণত

[৬০] করণীয় হিসেবে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ; বর্জনীয় হিসেবে হারাম এবং মাকরুহ।
[৬১] ইরশাদুল ফুহুল, শাওকানি, পৃষ্ঠা: ৩১।

আলোচিত হয়। যদিও মুহাদ্দিসগণ সুন্নাহর যে ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছেন, সেই অর্থে ঐতিহাসিকভাবে সুন্নাহর প্রামাণ্যতার বিষয়টি আলোচনা করেছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর আনুগত্য আবশ্যক

নবিযুগে সাহাবিগণ শরিয়তের বিধান লাভ করতেন কুরআন থেকে; কুরআন গ্রহণ করতেন স্বয়ং নবিজি থেকে। অনেক সময় কোনো বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আয়াত নাজিল হতো। কোনো বিষয়ে শর্তমুক্ত ব্যাপকার্থের আয়াত নাজিল হতো। যেমন সালাত পড়ার মূল আদেশ কুরআনে এসেছে। কিন্তু কুরআনে সালাতের রাকাতসংখ্যা, পদ্ধতি বা সময়সূচি কোনোটিই বর্ণিত হয়নি। আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, কুরআনে জাকাত প্রদানের মূল আদেশ এসেছে। কিন্তু জাকাতের পরিমাণ, কী পরিমাণ সম্পদ হলে জাকাত আদায় করতে হয় ইত্যাদি কোনো বিষয়ই কুরআনে আলোচিত হয়নি। এ ধরনের আরও বহু বিধান রয়েছে যা পালন করতে হলে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি, বিধানটির মৌলিক বিষয়গুলো ও কী কী কাজ করে ফেললে বিধানটি পালিত হয়েছে বলে গণ্য হবে না—এগুলো বিস্তারিত জানা দরকার হয়। তাই শরয়ি বিধানাবলি বিশদভাবে জানতে সাহাবায়ে কেরাম নবিজির দ্বারস্থ হতেন।

তা ছাড়া সাহাবিগণ এমন বহু ঘটনার সম্মুখীন হতেন, যেসবের বিধান কুরআনে পরিষ্কার বলা নেই। সেসব বিধান জানার জন্য নবিজির শরণাপন্ন না হয়ে তাদের কোনো উপায় ছিল না। কারণ নবিজি ছিলেন সরাসরি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দীনের বাহক এবং মানবকুলের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি—যিনি শরয়ি বিধানাবলির উদ্দেশ্য, সীমা-পরিসীমা, ধারা-উপধারা, লক্ষ্য ও মর্ম সবচাইতে গভীরভাবে জানতেন এবং উপলব্ধি করতেন।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনে তাঁর রাসুলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। রাসুল হলেন কুরআনের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারী। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

‘এবং আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি কুরআন, যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।’[৬২]

[৬২] সুরা আন-নাহল (১৬) : ৪৪।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

‘আর আমি তো আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি—যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।’[৬৩]

তা ছাড়া প্রতিটি বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ তাঁর রাসুলের ফয়সালা চূড়ান্তরূপে মেনে নেওয়া ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

‘আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা কখনো মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার আপনার ওপর অর্পণ করে; অতঃপর আপনার ফয়সালা সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তারা মেনে নেয়।’[৬৪]

আল্লাহ তাআলা আরও জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে দীন শেখানোর জন্য তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন ও হিকমত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ.

‘তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ করে আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন। রাসুল আল্লাহর প্রেরিত আয়াত তাদের নিকট তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; নিশ্চয় তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।’[৬৫]

[৬৩] সুরা আন-নাহল (১৬) : ৬৪।
[৬৪] সুরা আন-নিসা (০৪) : ৬৫।
[৬৫] সুরা আলি ইমরান (০৩) : ১৬৪।

কুরআন বর্ণিত এই 'হিকমত' কী? অধিকাংশ প্রাজ্ঞ আলিম ও গবেষকগণের অভিন্ন মত হলো, হিকমত কুরআন ছাড়া ভিন্ন কিছু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ তাঁর দীনের রহস্য ও শরিয়তের বিধি-বিধান জানিয়ে দিয়েছেন, তা-ই হলো 'হিকমত'। আলিমগণ একেই 'সুন্নাহ' নামে অভিহিত করেছেন। ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ২০৪ হিজরি) বলেন,

فَذَكَرَ اللهُ الكِتَابَ وَهُوَ القُرْآنُ، وَذَكَرَ الحِكْمَةَ فَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ العِلْمِ بِالقُرْآنِ يَقُولُ: الحِكْمَةُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ، وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ، لأَنَّ القُرْآنَ ذُكِرَ وَأُتْبِعَتْهُ الحِكْمَةَ، وَذَكَرَ اللهُ مَنَّهُ عَلَى خَلْقِهِ بِتَعْلِيمِهِمْ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ، فَلَمْ يَجُزْ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنْ يُقَالَ الحِكْمَةُ هُنَا إِلاَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مَقْرُونَةٌ مَعَ الكِتَابِ، وَأَنَّ اللهَ افْتَرَضَ طَاعَةَ رَسُولِهِ، وَحَتَّمَ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعَ أَمْرِهِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِقَوْلٍ، فُرِضَ إِلاَّ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ لِمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ أَنَّ اللهَ جَعَلَ الإِيمَانَ مَقْرُونًا بِالإِيمَانِ بِهِ.

'সুরা আলি ইমরানের উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রথমে কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো কুরআন। তারপর উল্লেখ করেছেন হিকমতের কথা। হিকমত কী? আমার আস্থাভাজন কুরআন-সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী আলিমগণকে বলতে শুনেছি, হিকমত হচ্ছে রাসুলের সুন্নাহ।

'দলিলবিচারে এই ব্যাখ্যাই সঠিক। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, কুরআনের কথা উল্লেখের পরপরই হিকমতের কথা বলা হলো। আবার আল্লাহ তাআলা কুরআন ও হিকমতের শিক্ষাদানকে মানুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই এই আয়াতে 'হিকমত' রাসুলের সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, কুরআনের সাথে সাথেই এই হিকমতের কথা বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তাঁর রাসুলের আনুগত্য ফরজ করে দিয়েছেন এবং তার আদেশ অনুসরণ করাও আবশ্যক ঘোষণা করেছেন। তাই কোনো বাণী মানা ফরজ বলা হলে, অবশ্যই সেই বাণী হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাহ। কারণ আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, আল্লাহ তার নিজের প্রতি ইমান আনয়নকে তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান স্থাপনের সাথে একই সূত্রে গেঁথেছেন।'[৬৬]

[৬৬] আর-রিসালাহ, ইমাম শাফেয়ি, পৃষ্ঠা: ৭৮।

ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, তিনি নিশ্চিতভাবে 'হিকমত' অর্থ 'সুন্নাহ' গ্রহণ করেছেন। কারণ, আল্লাহ হিকমত উল্লেখ করছেন কিতাবের সঙ্গে। যাতে প্রমাণিত হয়, উভয়টি এক বস্তু নয়, বরং পৃথক পৃথক। আর 'হিকমত'-এর মর্ম 'সুন্নাহ' ছাড়া অপর কিছু গ্রহণ করা সঠিক নয়। কেননা আমাদেরকে হিকমত শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি আল্লাহ নিজের বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আর যা সত্য ও সঠিক, তা ছাড়া অন্য কিছু বিশেষ অনুগ্রহ হতে পারে না। কাজেই কুরআনের মতোই 'হিকমত' অনুসরণ করা ফরজ। তা ছাড়া, এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ, আমাদের ওপর কুরআন ও রাসুলের অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই ফরজ করা হয়নি। সুতরাং এটা সুসাব্যস্ত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রকাশিত উক্তি ও শরিয়তের বিধানসমষ্টিই হলো 'হিকমত'।

ওপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন দেওয়া হয়েছে; সেই সাথে দেওয়া হয়েছে এমন আরও কিছু যা অনুসরণ করা ওয়াজিব। কুরআন ছাড়া এই অন্য বিষয়টির কথা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন—

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

'তিনি তাদের নেক কাজের আদেশ করেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন। তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করে দেন। আর তিনি তাদের মুক্ত করেন গুরুভার ও শৃঙ্খল থেকে যা তাদের ওপর পূর্বে ছিল।'[৬৭]

আয়াতটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব বর্ণনা করেছে। আয়াতের শব্দগুলো ব্যাপকার্থজ্ঞাপক। 'যা তিনি হালাল করেন ও হারাম করেন' —চাই তার উৎস কুরআন অথবা কুরআন ভিন্ন এমন ওহি যা আল্লাহ তাঁর কাছে পাঠান। এ কথার প্রমাণ মিকদাম ইবনু মাদিকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস,

أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

'জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আমাকে প্রদান করা হয়েছে কুরআন এবং এর সাথে অনুরূপ ভিন্ন ওহি।'[৬৮]

[৬৭] সুরা আল-আরাফ (০৭) : ১৫৭।
[৬৮] সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৪।

তা ছাড়া নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দ্বারাও রাসুলের কাছে প্রেরিত কুরআন ছাড়া ভিন্ন আরেকটি ওহির প্রামাণ্যতা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয়। কারণ এই আয়াতগুলোর প্রতিপাদ্য হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বিষয়ে আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছেন, তাতে রাসুলের আনুগত্য করা মুসলমানদের ওপর ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

‘রাসুল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন, তা তোমরা গ্রহণ করো; আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।’[৬৯]

তা ছাড়া কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ নিজের আনুগত্যের সাথে রাসুলের আনুগত্যকে সমসূত্রে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

‘তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো, নিশ্চয়ই তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।’[৭০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কাজের প্রতিই আহ্বান করেন, তাতে সাড়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.

‘হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তিনি আহ্বান করেন তোমাদেরকে এমন কাজে যা তোমাদের জীবন দান করে।’[৭১]

ইরশাদ হয়েছে, রাসুলের আনুগত্যই হলো আল্লাহর আনুগত্য, রাসুলের আনুগত্য হলো আল্লাহর মহব্বতের নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.

‘যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করল, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।’[৭২]

---

[৬৯] সুরা আল-হাশ্‌র (৫৯) : ৭।
[৭০] সুরা আলি ইমরান (০৩) : ১৩২।
[৭১] সুরা আল-আনফাল (০ ৮) : ২৪।
[৭২] সুরা আন-নিসা (০৪) : ৮০।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.

‘আপনি বলে দিন, যদি তোমরা একান্তই আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার আনুগত্য করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।’[৭৩]

আল্লাহ তাআলা রাসুলের আদেশের বিরোধিতার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

‘সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত; তাদের ওপর বিপদ আপতিত হবে অথবা তাদের ওপর এসে পড়বে কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’[৭৪]

এমনকি আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করা কুফরি কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

‘আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো, তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না।’[৭৫]

আল্লাহ তাআলা সাধারণভাবে রাসুলের আদেশ ও ফয়সালাকে অমান্য করার সামান্যতম অধিকার কাউকে দেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا.

‘আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন নর-নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। আর কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে।’[৭৬]

---

[৭৩] সুরা আলি ইমরান (০৩) : ৩১।
[৭৪] সুরা আন-নুর (২৪) : ৬৩।
[৭৫] সুরা আলি ইমরান (০৩) : ৩২।
[৭৬] সুরা আল-আহজাব (৩৩) : ৩৬।

বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে রাসুলকে বিচারক নির্বাচন করতে বা তাঁর ফয়সালা মানতে অসম্মতি প্রকাশ করা মুনাফিক হওয়ার চিহ্ন গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

‘এবং তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম, কিন্তু তারপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; আসলে তারা মুমিন নয়। আর যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আহ্বান করা হয়, যেন রাসুল তাদের বিরোধ মীমাংসা করে দেন, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুমিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। আর তারাই তো সফলকাম।’[৭৭]

শুধু কি তাই, যখন ইমানদারগণ নবিজির সাথে কোনো সামষ্টিক বিষয়ে একত্র হতেন, তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া কোথাও না-যাওয়াকে আল্লাহ ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ স্থির করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

‘তারাই প্রকৃত মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস করে এবং রাসুলের সাথে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হলে তারা তাঁর অনুমতি ব্যতীত সটকে পড়ে না; নিশ্চয়ই যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোনো কাজে আপনার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা আপনি অনুমতি দেবেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা

[৭৭] সুরা আন-নুর (২৪) : ৪৭–৫১।

করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৭৮]

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু : ৭৫১ হিজরি) বলেন,

فَإِذَا جُعِلَ مِنْ لَوَازِمِ الإِيمَانِ أَنَّهُمْ لاَ يَذْهَبُونَ مَذْهَبًا إِذَا كَانُوا مَعَهُ إِلاَّ بِاسْتِئْذَانِهِ فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ لَوَازِمِهِ أَنْ لاَ يَذْهَبُوا إِلَى قَوْلٍ وَلاَ مَذْهَبٍ عِلْمِيٍّ إِلاَّ بَعْدَ اسْتِئْذَانِهِ، وَإِذْنُهُ يُعْرَفُ بِدَلاَلَةِ مَا جَاءَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ أُذِنَ فِيهِ.

'যখন সাহাবিগণ রাসুলের সঙ্গে থাকেন, তখন তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও না-যাওয়াকে আল্লাহ তাআলা ইমানের অপরিহার্য অঙ্গ স্থির করেছেন। তাই বলাই বাহুল্য, নবিজির অনুমতি ছাড়া কোনো রায় প্রকাশ না করা বা কোনো মতানুসরণ না করা অবশ্যই ইমানের আবশ্যক অঙ্গ। নবিজি যে দীন ও দীনের উৎস নিয়ে আমাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন, তার দ্বারা যদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে থাকে, তবেই বুঝা যাবে, বিষয়টি তাঁর অনুমোদিত।'[৭৯]

এসব আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী রাসুলের মুখাপেক্ষী হওয়া সাহাবিগণের জন্য অপরিহার্য ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কুরআনের বিধান খুলে খুলে বলতেন। তিনি তাদের সামনে কুরআনের জটিল স্থানগুলোর সমাধান উপস্থাপন করতেন। তাদের মধ্যকার কলহ-বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। আর সাহাবিগণও নবিজির বিধি-নিষেধের সীমার ভিতরে থাকা অপরিহার্য মনে করতেন। যদি কোনো বিষয়ে তারা একান্ত নবিজির জন্য বিশেষ বিধান বলে অবগত হতেন, সেক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতেন। এ ছাড়া যেকোনো প্রকার নেক আমল, ইবাদত ও লেনদেন সর্বক্ষেত্রে তারা তাঁকেই অনুসরণ করতেন।

তাই তো তাঁর নিকট থেকেই সালাত-সম্পর্কিত বিধানাবলি, পদ্ধতি ও মৌলিক বিষয়গুলো গ্রহণ করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

[৭৮] সুরা আন-নুর (২৪) : ৬২।

[৭৯] ইলামুল মুওয়াক্কিইন আন রাব্বিল আলামিন : ১/৫৮।

‘আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখো, সেভাবে সালাত পড়ো।’[৮০]

তাঁর নিকট থেকেই হজের বিধানাবলি গ্রহণ করতেন। যেমন খোদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

‘তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হজের যাবতীয় বিধানাবলি গ্রহণ করো।’[৮১]

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ কোনো কাজে রাসুলের অনুসরণ করছে না জানতে পারলে তিনি বড় রাগ করতেন। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় *মুয়াত্তা* গ্রন্থে আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেন—

أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ. فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ يُحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ، فبلغ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ.

‘জনৈক সাহাবি তার স্ত্রীকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জানার জন্য পাঠালেন যে, সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি স্ত্রীকে চুমু খেতে পারে কি না। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা স্ত্রীলোকটিকে জানালেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাদার অবস্থায় তাকে চুমু খেতেন। স্ত্রীলোকটি এসে স্বামীকে এ কথা জানালেন। স্বামী বললেন, আমরা তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো নই। আল্লাহ তাঁর রাসুলের জন্য যা ইচ্ছা হালাল করে দিয়ে থাকেন। তাঁর এ উক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্রুতিগোচর হলে তিনি খুবই রাগ হলেন এবং বললেন,

[৮০] সহিহ বুখারি : ৬৩১।
[৮১] সহিহ মুসলিম : ১২৯৭।

إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِه.

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর বিধানাবলির সীমারেখা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত।"'[৮২]

হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনার সময়ও নবিজি রাগ হয়েছিলেন সাহাবায়ে কেরামের সাথে। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা ইহরাম খোলো এবং মাথা মুণ্ডন করো।' তারা সে মুহূর্তে তা করলেন না। কারণ সন্ধি হওয়াতে তারা নিদারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন। তখন তিনি নিজেই সবার আগে ইহরাম খুললেন। তাঁর অনুসরণে সকল সাহাবা তাড়াতাড়ি ইহরাম খুললেন।[৮৩]

নবিজিকে ধারণাতীত অনুসরণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। কোনো কারণ জানা ছাড়াই তারা নবিজি যা করতেন, তা-ই করতেন। তিনি যা বর্জন করতেন, তারাও তা বর্জন করতেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণের একটি আংটি পরিধান করলেন। সাহাবায়ে কেরামও স্বর্ণের আংটি বানিয়ে পরিধান শুরু করে দিলেন। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আংটিটি পরা ছেড়ে দিলেন। বললেন, আমি আর কখনো তা পরিধান করব না। তারপর সাহাবায়ে কেরামও তাদের আংটি পরা ত্যাগ করলেন।'[৮৪]

কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় *আশ-শিফা* গ্রন্থে আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 'একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম-সহ সালাতে রত, হঠাৎ তিনি তার জুতা মুবারক খুলে বাম পাশে রেখে দেন। তা দেখে সাহাবিগণও তাদের জুতা খুলে পাশে রেখে দিলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন জুতা খুলে পাশে রেখে দিলে? তারা বললেন, আমরা দেখলাম আপনি জুতা খুলে ফেললেন, তাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (আমি জুতা খুলেছি, কারণ) জিবরাইল (আ.) এসে আমাকে জানালেন, আমার জুতাতে নাপাক কিছু রয়েছে।'[৮৫]

ইবনু সাদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবিগণকে নিয়ে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত পড়তেন,

[৮২] মুয়াত্তা মালিক: ৭৯৭, ইমাম মালিকের সূত্রে হাদিসটি ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় *আর-রিসালাহ* গ্রন্থে (পৃ. ৪০৪) উদ্ধৃত করেছেন, আরও দেখুন, সহিহ মুসলিম : ১১০৮।
[৮৩] সহিহ বুখারি : ২৭৩১।
[৮৪] সহিহ বুখারি : ৭২৯৮।
[৮৫] সুনানু আবি দাউদ : ৬৫০।

তখনকার ঘটনা। একদিন মসজিদে জোহরের দু রাকাত সালাত পড়লেন। তারপর মসজিদুল হারামের দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য আদিষ্ট হলেন। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিগণও ঘুরে দাঁড়ালেন।'[৮৬]

শুধু কি তাই! সাহাবিগণ পার্থিব বিষয়েও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ হুবহু পালন করতেন। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় ইবনু মাসউদ মসজিদে এসে শুনতে পেলেন, বসে পড়ো। তিনি মসজিদের দরজাতেই বসে পড়লেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বললেন, ইবনু মাসউদ! এগিয়ে এসো (তিনি তাই করলেন)।'[৮৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতে তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামের আচরণ এমনই ছিল। নবিজির কথা, কাজ ও সমর্থনকে তারা শরয়ি বিধান বলেই গণ্য করতেন। এতে তারা কোনোপ্রকার মতবিরোধ করতেন না। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি কুরআনের সিদ্ধান্তের বিপরীত কোনো মত বা বিশ্বাস রাখতেন, বা কুরআনের বিপরীত কোনো কাজ করতেন। তারা রাসুলের কোনো কাজ বা কথা প্রকাশ পাওয়ার পর ভিন্ন কোনো কথা তুলতেন না।

• তবে যদি কোনো পার্থিব বিষয়ে নবিজি ওহির আদেশ ছাড়া নিজ বিবেচনায় কোনো কথা বলতেন, তখন তারা নিজেদের মনে যে কথা আসে তা রাসুলের সামনে প্রস্তাব হিসেবে উপস্থাপন করতেন। এর দৃষ্টান্ত হলো, বদর যুদ্ধে কোথায় শিবির স্থাপন করা হবে তা নিয়ে রাসুলের সাথে হুবাব ইবনুল মুনজিরের কথোপকথন।

• কখনো কোনো দীনী ব্যাপারেও তারা কথা বলতেন, তবে তা হতো আল্লাহর তরফ থেকে সেই বিষয়ের সমর্থন বা নিষেধাজ্ঞারূপে কোনো ওহি নাজিল হওয়ার পূর্বে। ওহি নাজিল হলে তাঁরা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে যেতেন। যেমন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধের বন্দি ও হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে রাসুলের সামনে নিজের চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন।

• কোনো কথা সাহাবিগণ না বুঝলে, তখন এর স্বরূপ জানার জন্য রাসুলের নিকট জিজ্ঞেস করতেন।

• আবার যদি বুঝতেন কোনো কাজ একান্তই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষ,

---

[৮৬] আত-তাবাকাতুল কুবরা: ২/৭।

[৮৭] সুনানু আবি দাউদ : ১০৯১; জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি, ইবনু আবদিল বার: ২/৮৬৪ (১৬৩২)।